চাঁদমামা
সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
৭০ P
http://jhargramdevil.blogspot.com

Photo by : DEVIDAS KASBEKAR

গুপ্তধনের খোঁজে রাম আর শ্যাম
দুই বন্ধুর দায় হ'ল আর যাবে থাকা, কাগজ পেল গুপ্তধনের নকশা আঁকা
বীরের মত অ্যাডভেঞ্চার করার আশায়, ঝটপট ওরা সমুদ্রে নৌকা ভাসায়
এমনিতে বেশ নির্ঝঞ্ঝাট ক'দিন গিয়ে, হঠাৎ দ্যাখে তুফান এলো ঘূর্ণী নিয়ে
অ্যাডভেঞ্চার খুব জমল দারুণ ঝড়ে, ভেসে এসে ওরা একটা চরে পড়ে
বেশ কিছুক্ষণ এধার ওধার ঘুরে ঘুরে, দেখতে পেল ছোট্ট কুঁড়ে অনেক দূরে
একটা বুড়ো ঝিমুচ্ছিল নাক ডাকিয়ে, নকশা দেখে বেবাক অবাক রয় তাকিয়ে
খাও বাছারা গুপ্তধনের সেরা পপিন্স, মিষ্টি ফলের বীর বাচ্চার প্রাইজ-পপিন্স
খেতে ভাল · দেখতে ভাল · ভাবতে ভাল
পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদে ভরা লজেন্স
PARLE POPPINS FRUITY SWEETS
৫ রকম ফলের স্বাদে ভরপুর-
রাস্পবেরী. আনারস, লেবু, কমলালেবু ও মৌসম্বী
প্রত্যেক প্যাকেটে ১৩টি লজেন্স
everest/507/PP Ben

চাঁদমামা
সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি
দেশে অধর্মের কাজ হচ্ছে ? ঠিক আছে আমি রাজা হয়ে অধর্ম দূর করে দেব। কিন্তু গণ্ড রাজা হয়ে পারল না ধর্মস্থাপনা করতে। ফিরে গেল বনে। বড়লোকদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে গরিবদের মধ্যে বিলোতে লাগল। এই হল এবারের বেতাল কথায় পরিবেশিত কাহিনী।
ভীরুকে কিভাবে সাহসী করে তোলা যায় তা জানা যাবে 'দণ্ডীর বুদ্ধি' পড়ে। ধার আদায় করার কৌশল জানতে হলে পড়তে হবে 'ধার আদায়।' এছাড়া আরও অনেক গল্প আছে।
খণ্ড ২ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সংখ্যা ৩
CP
CHITRA

বজ্রাদপি কঠোরাণী, মৃদুনি কুসুমাদপি,
লোকোত্তরাণাম্ চেতাংসি, কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি ? ॥ ১ ॥

[বজ্রের চেয়ে কঠিন এবং ফুলের চেয়ে কোমল হলেও লোকোত্তরদের কে বুঝতে পারে ?]

অলোক্য সামান্য, মচিন্ত্য হেতুকম্,
দ্বিষংতি মন্দা শ্চরিতম্ মহাত্মণাম্ । ॥ ২ ॥
(কালিদাস)

[সাধারণের পক্ষে অসাধ্য এবং সাধারণের কল্পনাতীত কোন কাজ যখন মহাত্মারা সম্পন্ন করেন তখন তারা সেই কাজের নিন্দে করে।]

অনুগন্তুম্ সতাম্ বর্ত্ম
কৃৎস্নাম্ যদি ন শক্যতে
স্বল্প ম স্বনুগন্তব্যম্
মার্গস্থো নাবসীদতি। ॥ ৩ ॥

[সৎপুরুষদের পথ পুরোপুরি অনুসরণ করা যদি সম্ভব না হয় তাহলে কিছুটা তো অনুসরণ করা উচিত। উত্তম পথে যাঁরা চলেন তাঁরা কখনও বিনাশ হন না।]

মহাত্মাদের রীতিনীতি

দণ্ডীর বুদ্ধি

রাহুলপুরের রাজা শিলাসিংহ মারা গেলেন। তাঁর ছিল একটি মাত্র পুত্র। নাম তার বীরসিংহ। বয়স একুশ। বীরসিংহের বয়স যখন মাত্র পাঁচ মাস, তখন তার মা মারা যায়।

ফলে বাপের আদরেই সে বড় হয়ে ওঠে। মার স্নেহ সে পায়নি।

বাপের মৃত্যু তার কাছে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। তার মন ভেঙ্গে গেল। অনেকেই তার মঙ্গল কামনা করত। তার কাছাকাছি থেকে তাকে সান্ত্বনা দিত। তবু সে শান্তি পেত না। তার মনে হত সে বড় একা। সংসারে তার আপনজন বলতে কেউ নেই।

এ হেন অবস্থায় তাকে সিংহাসনে বসতে হল। সে বসল। কিন্তু তার মন বসল না। রাজ-কাজ তার দেখতে ভাল লাগত না। নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়ে থাকত। বাইরে বেরুতেও তার ইচ্ছে করত না। বহু চিকিৎসক তাকে পরীক্ষা করল। কিন্তু কোন ফল হল না। দুশ্চিন্তায় দিনের পর দিন বিছানায় শুয়ে থাকার ফলে তার শরীর ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

রাজবৈদ্যও যখন তাকে সারিয়ে তুলতে পারল না, তখন সেনাপতি ও মন্ত্রীদের মধ্যে দুর্ভাবনার কালোছায়া নেমে এল। বাপের বেঁচে থাকতে যে বীরসিংহ অত্যন্ত সাহসী হিসেবে নাম করেছিল তাকে সব সময় বিছানায় পড়ে থাকতে দেখে কার না খারাপ লাগে। কিশোর বয়সেই বীরসিংহ একটি চিতাবাঘ মেরেছিল। আর সেই

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

বীরসিংহ ভীরুর মত সব সময় ঘরে বসে থাকে।

দেশের যত বৈদ্য ছিল, সবাই চেষ্টা করেছিল বীরসিংহকে সারিয়ে তোলার। কিন্তু কোন ফল হল না।

শেষে দরবারের এক যাদুকর প্রধান মন্ত্রীর কাছে এসে বলল, "মন্ত্রী মশাই, দেশের বৈদ্যরা সবাইতো আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখেছেন, আপনার অনুমতি পেলে আমি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে পারি।"

"দেখ দণ্ডী, প্রাসাদের মহাবৈদ্যও আমাদের বীরসিংহকে সারিয়ে তুলতে পারেনি। এহেন অবস্থায় তুমি কি তোমার দাদুর সাহায্যে তার অসুখ সারাবে?" প্রধান মন্ত্রী জিজ্ঞেস করল।

"চেষ্টা করে দেখতে চাই।" যাদুকর দণ্ডী বলল।

প্রধান মন্ত্রী মনে মনে হেসে বলল, "বেশ দেখ একবার চেষ্টা করে।"

দণ্ডী শুরু করল নিজের কাজ। সে রাজকুমারের ঘরে ঢুকে বলল, "জয় হোক আপনার। আজ কেমন আছেন?"

বীরসিংহ উদাস হাসি হেসে বলল, "আমার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করছ? না মরে বেঁচে আছি। আর কিছুদিনের মধ্যেই বাবার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আমার সমস্ত শক্তি বাবাই নিয়ে গেছেন। উনি চলে গেলেন আমার শক্তিও চলে গেল। এ দুনিয়ায় আমার আপনজন বলতে কেউ নেই।"

দণ্ডী বীরসিংহের অসুখের মূল কারণ ধরতে পারল। বীরসিংহ বাপের ওপরে সব চেয়ে বেশী নির্ভর করত।

সেইজন্য তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার নির্ভরতার খুঁটি নড়ে গেল। ফলে বীরসিংহ শক্তি ও সাহস হারাল। তার মনে স্থান করে নিল ভীরুতা।

বীরসিংহের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে দণ্ডী তাকে নানা রকমের হাল্কা হাসির গল্প শোনাল। কিছুটা সে সফল হল। দণ্ডী

লক্ষ্য করল, বীরসিংহ একটু হাল্কা মেজাজে কথাবার্তা বলছে। তার সেই মেজাজের সময় দণ্ডী নানা ধরণের জাদু দেখাত। দেখতে দেখতে বীরসিংহ ঘরের বাইরে দণ্ডীকে নিয়ে বেরুতে লাগল। দুজনে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে মাঝে মাঝে পায়চারি করে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গল্প করত। বীরসিংহের এইরূপ পরিবর্তন হতে দেখে প্রধান মন্ত্রী খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

এক মাস হয়ে গেল। রাজকুমারকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। যখন তখন সে দরবারে আসত। একদিন সে দণ্ডীর সঙ্গে দরবারে যাচ্ছে এমন সময় উপর থেকে একটা বিড়াল তার সামনে লাফিয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সে "বাঘ! বাঘ! মরে গেলাম! বাবা বাঁচাও!" বলে দুই হাতে চোখ ঢেকে চিৎকার করতে লাগল। ভয়ে তার শরীর কাঁপছিল।

দণ্ডী বলল, "রাজকুমার এটা বাঘ নয় এটা বিড়াল। ভয় পাবেন না। বাঘ নয়। চোখ খুলে তাকান।"

বীরসিংহ আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখল সত্যিই একটি বিড়াল।

দণ্ডী বিড়ালটাকে হাতে নিয়ে বলল, "এর গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। আচ্ছা আপনার মনে আছে আপনি কিশোর বয়সে একাই একটা চিতাবাঘ নিজের হাতে মেরে-

ছিলেন ? এখন তো আপনি ইচ্ছে করলে খালি হাতেই বাঘ মারতে পারেন।”

“আমার মধ্যে সে শক্তি আর নেই। বাবার মৃত্যুর পর আমার সে শক্তি শেষ হয়ে গেছে। একটি বাচ্চা ছেলের চেয়ে আমি দুর্বল।” বীরসিংহ বলল।

“সত্যিই যদি তা হয়ে থাকে তাহলে আমি আমার জাদুর সাহায্যে সেই শক্তি আপনার মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারি। বলুন পারি কিনা ? আমার শক্তি আছে কিনা আপনিই বলুন।” দণ্ডী বলল।

“থাকবে না কেন ? নিশ্চয়ই আছে। অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পেয়েছি তোমার।” বীরসিংহ বলল।

“তাহলে চলুন, আপনি চিতাবাঘ মারতে। এগোন।” দণ্ডী বলল।

বীরসিংহ নিশ্চলভাবে দণ্ডীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেল।

দণ্ডী নিজেই একটা কায়দা করে বিড়ালকে ওপর থেকে ফেলেছিল। দণ্ডীর এভাবে বিড়াল ফেলার কারণ হল বীর-সিংহের মন থেকে ভীরুতা দূর করে তার মনে সাহস সঞ্চার করা।

কোন রকমে বীরসিংহকে দিয়ে একবার চিতাকে মেরে ফেলাতে পারলে তার উদ্দেশ্য সফল হবে।

দণ্ডী পাতলা কাঠকে চিতাবাঘের আকারে কাটিয়ে নিল। এমন ভাবে কাটাল যেন চিতা দুপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুটো কাঠ দিয়ে একটি চিতাবাঘ তৈরী করে তার ভেতরে একটি পাতলা আঁকাবাঁকা নলি পুরে দিল (চিত্রে দ্রষ্টব্য)। তার পর সেই কাঠের উপর চিতার রঙ লাগিয়ে নিল। ঠিক যেন একটি জলজ্যান্ত চিতা-বাঘ। তারপর ঐ নলির ভেতর দিয়ে একটি দড়ি ঢুকিয়ে তার পেছনের দিকটা পায়ে চেপে রেখে মাথার দিকের দড়িটা হাতে ধরল। পরে সেই দুটো কাঠ দিয়ে তৈরি করা, নল পোরা, রঙ লাগানো চিতাবাঘকে বীরসিংহের সামনে ধরল।

দণ্ডী বলল, "এই হল চিতাবাঘের যন্ত্র। দয়া করে দেখুন এই খেলনার উপর আমার প্রভাব। আপনি তো দেখেছেন, প্রাণীদের উপর আমার প্রভাব কতখানি? এবার দেখুন এই প্রাণহীন খেলনার উপর আমার প্রভাব।" দড়ির নিচের দিকের শেষ ভাগ পায়ে চেপে রেখে মাথার দিকের দড়িটা হাতে ধরল। বাঘ দড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নাবল। তখন আবার পায়ের দিকের দড়ি হাতে ধরে এবং হাতের দড়িটা পায়ে চেপে পুতুলের ঐ নলির কাছে মুখ রেখে কি যেন বলে ফুঁ দিল দণ্ডী। চিতাবাঘ খেলনার মাথা এখন নিচের দিকে আর পা উপরের দিকে। তারপর জোরের সঙ্গে বলল, "দেখুন রাজা বীরসিংহ এই খেলনা এখন আমার মন্ত্রপ্রাপ্ত। আমি যা বলব, এ তাই শুনবে। আমি যদি বলি দাঁড়াও, ও দাঁড়াবে। আমি যদি বলি লাফাও, ও লাফাবে।"

দড়িতে ঐ ভাবে খেলা দেখাতে দেখাতে এক একবার দণ্ডী বলল, "থামো।" খেলনা থেমে গেল। আবার বলল, "চল।" খেলনা চলল। বীরসিংহ এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল।

তারপর দণ্ডী শান্ত স্বরে বলল, "রাজা বীরসিংহ এ শক্তি আমার নয়। এই তাবিজের জোরেই চিতাবাঘের খেলনা চলছে থামছে।" একথা বলে দণ্ডী নিজের বাঁ

হাত থেকে একটি তাবিজ খুলে বীরসিংহের বাঁ হাতে পরিয়ে দিয়ে বলল, "রাজা বীর-সিংহ এখন থেকে এই খেলনা আপনার কথামত চলবে।

তারপর বীরসিংহ ঐ খেলনাটা নিয়ে ঐ ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে দণ্ডী যা করছিল তাই করল।

নলিটা বাঁকা থাকায় হঠাৎ দড়িতে টান পড়লেই খেলনাটা থেমে যেত। আবার দড়িটা ঢিলা দিলেই গড়াতে গড়াতে নিচে পড়ে যেত।

নলিটা যে বাঁকা এ সব ব্যাপার বীরসিংহ জানত না। তাই ঘটনাটা তার কাছে বিস্ময়ের ছিল। তাবিজ পরানোর পরে সত্যি সত্যিই বীরসিংহের মনে সাহস ফিরে এল। তার মনে হল তার শরীরে শক্তি ফিরে এসেছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যানে একটি চিতাবাঘ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দণ্ডী আগে থেকেই ঐ চিতাবাঘকে আফিম খাইয়ে দিয়েছিল।

বীরসিংহ অন্য দিনের মত সেদিনও দণ্ডীর সঙ্গে উদ্যানে এসে হঠাৎ সামনে একটি চিতা দেখতে পেল। চিতা বীর-সিংহের দিকে তাকাল।

বীরসিংহ তরবারি দিয়ে তাকে আক্রমণ করল। যেহেতু তার হাতে তাবিজ ছিল সেই হেতু রাজা বীরসিংহের মনে কোন ভয় অথবা দ্বিধা ছিল না। চিতাবাঘ তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

পরিকল্পনা অনুযায়ী কিছু লোক ধারে কাছে ছিল। তারা মহা উল্লাসে সমস্বরে বলে উঠল, "মহারাজ বীরসিংহের জয় হোক! মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন।"

পরক্ষণেই বীরসিংহের পরিপূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসের দৃঢ়তার ফলে তার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

যক্ষপর্বত

চোদ্দ

[গুরু-ভালুকের শিষ্যরা খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে একটা সুড়ঙ্গ দিয়ে নিয়ে গেল, নেকড়েদের মধ্যে যে উঁচু পাথর ছিল সেখানে। সকাল হতেই ভালুক-শিষ্যরা নেকড়েদের খাবার দিতে এল। খড়্গবর্মার তীরে একজন শিষ্য মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। এ খবর পেয়েই পঞ্চশূল নিয়ে গুরু-ভালুক এগিয়ে গেল। তারপর···]

খড়্গবর্মার তীর লাগার সঙ্গে সঙ্গে ভালুক জাতের একজন শিষ্য আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওর পড়ে যাওয়ার পর খড়্গবর্মা ও জীবদত্তের টনক নড়ল। তারা তখন বুঝতে পারল যে তাদের বিপদ আসবে নেকড়েদের দিক থেকে নয়, তাদের এবার বিপদে ফেলবে ভালুক জাতের শিষ্যরা।

জীবদত্ত সুড়ঙ্গের উপরের দরজার দিকে কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকাল। লক্ষ্য করল তার দিকে কোন শিষ্য এগিয়ে আসছে কিনা। তারপর মাথা ঘুরিয়ে বলল, "সমরবাহু, আমরা অবিলম্বে দুদিক থেকে আক্রান্ত হতে পারি। আমরা যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছি তার নিচের সুড়ঙ্গ পথে ওরা আসতে পারে আর অন্য পথ

হল আমাদের সামনের ঐ সুড়ঙ্গ পথ। তাই এই ছুটো পথের দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাড়াহুড়ো করে কিছু করলে আবার হিতে বিপরীত হবে।"

একথা শুনে সমরবাহুর চোখ মুখের অবস্থা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ভাঙ্গা গলায় বলল, "হুজুর, আপনারা দুজন আমার নেতা। আমাকে একমাত্র আপনারাই বাঁচাতে পারেন। আপনারা যা বলবেন তাই করব।"

সমরবাহুর অতটা ঘাবড়ানো দেখে খড়গবর্মার হাসি পেল। হাসি চেপে সে বলল, "সমরবাহু, বিঘ্নেশ্বর পূজারী ও স্বর্ণাচারির কাছে তোমার সম্পর্কে শুনেছি। জানতে পারলাম তুমি নাকি রেগিস্তান থেকে এসেছ এখানে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে? এত বড় কাজে বেরিয়ে এই সামান্য ঘটনায় তোমার এত ভয়? এই বিপদ থেকে কিভাবে মুক্ত হতে পারি সে সম্পর্কে একটু ভাবতে পার না?"

"কি ভাবব? এরা যে কি মারাত্মক ধরণের আপনি তা জানেন না। শত্রু ক্ষত্রিয় হলে আমি তৎক্ষণাৎ তরবারি দিয়ে আক্রমণ করতে পারতাম। কিন্তু এরা যে মন্ত্রতন্ত্র জানা নেকড়ে আর ভালুকের চামড়া পরা অদ্ভুত মানুষ নামক জন্তু। এদের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হয় আমি যে তা জানিনা।" সমরবাহু কাঁপা কাঁপা গলায় বলল।

সমরবাহুর কথা শুনে জীবদত্তের হাসি পেলেও সে তা প্রকাশ না করে বলল, "সমরবাহু, তুমি যে কত বড় বীর তার প্রমাণ দেবার সময় এসেছে। এই পাথরের নিচের সুড়ঙ্গ দিয়ে যাতে কোন শত্রু না আসে তার ব্যবস্থা তোমরা দুজনে কর। এতক্ষণে গুরু ভালুক খবর পেয়ে গেছে যে তার এক শিষ্য তীরবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। এবার দেখা যাক ও কি করে।"

জীবদত্তের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই গুরু ভালুক সুড়ঙ্গের দরজায় দাঁড়িয়ে রক্তচক্ষু করে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল

কিছুক্ষণ। ওরাও তাকিয়ে ছিল গুরু ভালুকের দিকে। গুরু-ভালুক বলল, "পাজি বদমাইশের দল! তোমাদের এতবড় সাহস! হুঁ! তোমরা স্বয়ং বৃকেশ্বরীর শিষ্যকে তীর দিয়ে মেরে ফেলেছ! এখন তোমাদের পঞ্চশূলে বিদ্ধ করে নেকড়েদের খাবার করে ফেলছি। প্রস্তুত হও।"

গুরু-ভালুকের আওয়াজ শুনতে পেয়ে নেকড়েগুলো গর্জন করতে লাগল। তারা যেন জোট পাকিয়ে অভিযোগ করছে তাদের খাবার দাবার দেওয়া হয়নি বলে। প্রত্যেকদিন এই সময় খাবার দেওয়া হয় অথচ আজ খাবার দেবার লোকের পাত্তা নেই। তারা গুরু-ভালুকের দিকে মাথা উঁচু করে তাকিয়ে গর্জন করে প্রার্থনা করছে কি দাবি জানাচ্ছে বোঝা গেল না। নেকড়েগুলো অস্বাভাবিকভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে গর্জন করছে। গুরু-ভালুক যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল তা মাটি থেকে মাত্র দশ ফুট উঁচু। নেকড়েগুলো যে রকম করছে হঠাৎ ঐ পাথরের উপর লাফিয়ে উঠে পড়াও বিচিত্র নয়। আবার তক্ষুনি সুড়ঙ্গ পথে ফিরে গেলে সমরবাহু প্রমুখরা তাকে ভীত ভাবতে পারে। এই সব সাত-পাঁচ ভেবে গুরু-ভালুক না পারছে এগোতে না পারছে পেছতে। আবার পারছে না দাঁড়িয়ে থাকতেও। সে কেমন

যেন হয়ে গেল। পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জীবদত্ত এমন ভাব করল যেন সে গুরু-ভালুকের মনের অবস্থা বুঝতে পেরেছে। হঠাৎ হাতের মন্ত্রদণ্ড উপরে তুলে চিৎকার করে বলল, "ওরে এই গুরু-ভালুক! আমি বুঝতে পারছি না, তুমি নিজে ভালুক জাতের হয়ে কেন বৃকেশ্বরীর পূজো করছ। তোমার তো ভালুকেশ্বরীর পূজো করা উচিত। বেশ বুঝতে পারছি তুমি বুদ্ধিতে খাট আছ। এই দেখ আমি তোমার সামনে এতগুলো নেকড়ের মাঝ দিয়ে তোমার কাছে যাচ্ছি। তুমি পালিয়ো না। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাক। নড়বেনা কিন্তু।"

এই ঘোষণা শুনে সমরবাহুর ভীষণ ভয় করল। জীবদত্ত যা বলেছে তাই করেছে। এখন যা বলছে তাও করতে পারে ভেবে সে বলল, "কী বলছেন হুজুর! এই এতগুলো নেকড়ের ভিতর দিয়ে ওর কাছে যাবেন? এ কিন্তু সেধে বিপদ ডেকে আনা হচ্ছে। তাছাড়া গুরু-ভালুক মন্ত্রতন্ত্রও জানে।"

একথার পিঠে খড়্গবর্মা হাতের তরবারি উপরে তুলে বলল, "সমরবাহু, আমার এই তরবারি আর জীবদত্তের ঐ মন্ত্রদণ্ডের ক্ষমতা যে কত বেশি তা তুমি জান না বলেই অত ভয় পাচ্ছ ঐ গুরু-ভালুককে।"

খড়্গবর্মার কথা শেষ হতে না হতেই ওরা যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে ছিল তার ওপার থেকে অনেকগুলো মানুষের গলা শোনা গেল। ঐ চিৎকার হৈচৈ শুনে জীবদত্ত সঙ্গীসাথীদের সাবধান করে দিয়ে বলল, "তোমরা সাবধানে থেকো। গুরু-ভালুক এই পাথরের নিচের সুড়ঙ্গ পথে কিছু শিষ্যকে পাঠিয়ে আমাদের আক্রমণ করার ব্যবস্থা করেছে।"

এই সাবধানবাণী শুনেই সমরবাহু ও অনুচর বল্লম তুলে পাথরের নিচের সুড়ঙ্গ পথের দিকে তাক্ করে দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে ওদিক থেকে গুরু-ভালুক তার এক শিষ্যকে বলল, "এরা এত বোকা হয়ে গেল কেন বুঝতে পারছি না। আমি বলে ছিলাম চুপচাপ গিয়ে অতর্কিতে ওদের উপর আক্রমণ করতে। কিন্তু এই জানোয়ারগুলো হৈ হৈ করে একটা দেশ জয় করার মত গেল! ওরা তো বুঝে গেছে। এখন কি হবে! ওদের হাতে অস্ত্র দিয়ে ঐ পাথরের উপর পাঠানোই ভুল হয়েছে দেখছি।"

জীবদত্ত অনুমান করতে পারল গুরু-ভালুকের চিন্তা ভাবনা। খড়্গবর্মাকে সে বলল, "খড়্গবর্মা, এখন গুরু-ভালুকের উপর তীর চালানো বৃথা। তুমি তার দিকে তীর-ধনুক ঠিক করে দাঁড়ালেই সে টের পেয়ে পালাবে। ও সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে গেলে আর তাকে ধরা যাবে না।"

"তোমার কথা ঠিক। কিন্তু সমরবাহুকে এদের হাত থেকে উদ্ধার করে স্বর্ণাচারির কাছে পাঠানো যাবে কি করে?" খড়্গবর্মা জীবদত্তকে জিজ্ঞেস করল।

জীবদত্ত কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "খড়্গ-বর্মা, সমরবাহুকে কি করে মুক্ত করা যায় তা আমি ভেবেছি। মনে আছে, আমরা সিংহ শিকার করে পদ্মপুরের রাজার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। ঠিক ঐ ভাবেই নেকড়ে শিকার করে এই সুড়ঙ্গে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে হবে।"

"তাহলে আর দেরি কেন? শুরু করা যাক।" খড়্গবর্মা উৎসাহভরে বলল।

"তবে তাই হোক। তুমি ঐ মরা নেকড়েটাকে কাঁধে ফেলে নাও। এর মাংস খাওয়ার জন্য নেকড়েগুলো তোমার পিছনে ধাওয়া করবে। সুযোগ পেলে অবশ্য তোমাকেও আক্রমণ করতে ছাড়বে না। অতএব সতর্ক থেকো। নিজের তরবারি সব সময় উঁচিয়ে রাখতে ভুলো না।" জীবদত্ত বলল।

জীবদত্ত মরা নেকড়েকে কাঁধে ফেলে নিল। জীবদত্তের কথা আর খড়্গবর্মার কাজ সমরবাহু বুঝতে পারল না। ভয়ে ভয়ে বলল, "হুজুর, আপনারা কি বলছেন আর কি করছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি কিন্তু ভীষণ ভয় পাচ্ছি।"
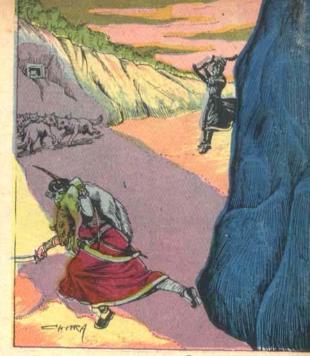
"সমরবাহু, ভয় পেয়োনা। নিচের সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে ওরা যদি এখানে আসতে চেষ্টা করলে এক একজনকে বল্লম দিয়ে মেরে ফেলবে। ওরা দল বেঁধে এখানে আসতে পারবে না। এক এক করেই এই সরু পথে আসতে বাধ্য। আমরা দুজনে নেকড়েদের মধ্যে নেমে যাচ্ছি। চেষ্টা করব যে পথে গুরু-ভালুক এসেছে ঐ পথেই নেকড়েদের ঢুকিয়ে দিতে। তাহলেই এই সুড়ঙ্গে, এই দুর্গে দারুণ ছোটাছুটি পড়ে যাবে।"

"হুজুর, এ কিন্তু দুঃসাহসের কাজ হচ্ছে।" সমরবাহু বলল।

"সাহসের কাজ হতে পারে কিন্তু এটাকে দুঃসাহসের কাজ কোন ক্রমেই বলা যায় না।

সমরবাহু আর কিছুক্ষণের মধ্যে তুমি নিজেই দেখতে পাবে।" জীবদত্ত হাসতে হাসতে বলল।

"জীবদত্ত, আজেবাজে কথাতেই সময় চলে যাচ্ছে। আমি আর কতক্ষণ এই মরা নেকড়ে কাঁধে করে দাঁড়িয়ে থাকব?" খড়্গবর্মা বলল।

"এবার তাহলে নাবছি। যতগুলো সম্ভব নেকড়েকে নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। আমি তোমার পিছনে পিছনে ছুটতে থাকব। তারপর ..."

জীবদত্তের কথা শেষ হতে না হতেই খড়্গবর্মা চিৎকার করে বলল, "ওহে গুরু-ভালুক, আমরা তোমার কাছে যাচ্ছি। জানে বাঁচতে চাও তো তুমি আর তোমার বৃকেশ্বরীদেবী এই সুড়ঙ্গ আর দুর্গ ছেড়ে পালাও।" একথা বলে খড়্গবর্মা পাথরের উপর থেকে নিচে ঝাঁপ দিল।

দুজন মানুষকে মরা নেকড়ে কাঁধে নিয়ে লাফিয়ে পড়তে দেখে নেকড়েগুলো গর্জন করে ওদের দিকে ধেয়ে এলো।

খড়্গবর্মা মরা নেকড়ে কাঁধে নিয়ে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছোটাছুটি করতে লাগল। নেকড়েদের পিছনে ছুটল জীবদত্ত। জীবদত্ত মন্ত্রদণ্ডের আঘাতে আঘাতে বহু নেকড়েকে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে দিল।

সুড়ঙ্গের মুখে দাঁড়িয়ে এই সব ব্যাপারকে তামাশা ভেবে চিৎকার করে হাততালি বাজাতে বাজাতে বলল, "এ সবই মা বৃকেশ্বরীর ইচ্ছা। শত্রুর মতিভ্রম ঘটিয়ে তাদের নিজের বাহনের মধ্যে নাবিয়ে দিয়েছেন। স্বয়ং মা বৃকেশ্বরী ইচ্ছা করলে কী না করতে পারে।" একথা বলে সে চোখ বুজে ভক্তিভরে উপরের দিকে তাকাল।

এতক্ষণ ঘুরছিল খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত। গুরু-ভালুকের অবস্থা দেখে তারা ঠিক করল এই সুযোগেই যা করার করে ফেলতে হবে। জীবদত্ত খড়্গবর্মাকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, "খড়্গবর্মা, এই হল মোক্ষম মুহূর্ত।"

খড়্গবর্মা পরমুহূর্তেই মরা নেকড়েকে কাঁধ থেকে তুলে সোজা ছুঁড়ে দিল গুরু-ভালুকের উপর।

নিজেদের খাদ্যকে পড়তে দেখে চার-পাঁচটা নেকড়ে লাফিয়ে পড়ল সেই-খানে। চোখ খুলে গুরু-ভালুক দেখে তার কাছে একটি মৃত ও চার-পাঁচটা জ্যান্ত নেকড়ে লাফালাফি করছে।

তারপর গুরু-ভালুক "হে বৃকেশ্বরী!" বলে ডেকে উঠে নেকড়েদের ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিলে, "নেকড়ে! নেকড়ে!" বলে চিৎকার করতে লাগল শিষ্য কজন। তারা সুড়ঙ্গে চিৎকার করতে করতে ছোটাছুটি করতে লাগল।

গুরু-ভালুক কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, তার কাছেই মৃত নেকড়েকে টেনে ছিঁড়ে খাচ্ছে কয়েকটা নেকড়ে। একটি নেকড়ে কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছে না এক টুকরো ছিঁড়ে নেবার। সে একটু সরে দাঁড়িয়ে গুরু-ভালুকের দিকে গর্জন করতে করতে তাকাচ্ছিল। তার মতলব বুঝতে পেরে গুরু-ভালুক শূলে বিদ্ধ করে বলল, "দেবী বৃকেশ্বরীর প্রধান ভক্তকেই তুই খেতে চাস! তোর এত বড় সাহস!" বলে পেছিয়ে সুড়ঙ্গ পথে ঢুকে গেল গুরু-ভালুক।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত আপ্রাণ চেষ্টা করছে অন্য নেকড়েদের তাড়া করে ঐ

সুড়ঙ্গ পথে ঢুকিয়ে দেবার। ওরা বুঝতে পারল না সুড়ঙ্গে ইতিমধ্যে কি ঘটে গেছে। তারা এও জানতে পারল না যে গুরু-ভালুক নেকড়ের পেটে গেছে কিনা।

"খড়্গবর্মা, আমাদের আর এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। একটা খটকা রয়ে গেল। গুরু-ভালুক মারা গেছে কিনা সঠিক জানা গেল না। তবে এটা ঠিক নেকড়ে ঢোকার ফলে সুড়ঙ্গে এক দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হবে। একটা কোলাহল শুনতে পাচ্ছ?" জীবদত্ত বলল।

"শুনতে পাব না কেন? আমার ধারণা এতক্ষণে ঐ ভীতু লোকগুলো সুড়ঙ্গ ছেড়ে বনে পালিয়েছে। তবে যে কোন ভাবে গুরু-ভালুককে জ্যান্ত ছাড়া উচিত নয়।" খড়্গবর্মা নিজের মত জানাল।

"আমরাও চল ঢুকি ঐ সুড়ঙ্গ পথে। সমরবাহু ও তার অনুচরকে তাড়াতাড়ি ডাক এখানে।" জীবদত্ত বলল।

"খড়্গবর্মার ডাক শুনে সমরবাহু ও তার অনুচর এক লাফে ঐ পাথরের উপর থেকে নেমে ছুটে এল তাদের কাছে। জীবদত্ত ওদের বলল, "সমরবাহু, আমরা এখন ঐ পথ দিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকতে যাচ্ছি।"

"আমরা এই সুড়ঙ্গের সবাইকে জব্দ করতে পারব? সব চেয়ে ভাল হত অন্য কোন পথ দিয়ে এখান থেকে পালিয়ে বনে চলে যাওয়া।" সমরবাহু ভয়ে ভয়ে বলল।

"আমরা নেকড়েদের মধ্যে ছিলাম। এখান থেকে বাইরে যাওয়ার অন্য কোন পথ নেই। এই পথেই যেতে হবে আমাদের!" বলে জীবদত্ত এক লাফে সুড়ঙ্গ পথের মুখে পৌঁছে গেল। তার পিছনে গেল খড়্গবর্মা।

সমরবাহু ও তার অনুচর কি করবে ঠিক করতে না পেরে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক তখনই ওদের খাবার আশায় এক এক করে নেকড়েগুলো ওদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। (আরও আছে)

ধর্মস্থাপনা

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বিক্রমাদিত্য গাছের কাছে ফিরে গিয়ে, গাছে উঠে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে চুপচাপ হাঁটতে লাগলেন। বেতাল বলে উঠল, "রাজা, তুমি ধর্মাধর্ম রক্ষার কাজে এগিয়ে যাচ্ছ? মনে রেখ ধর্ম রক্ষা করা অত সহজ ব্যাপার নয়। গণ্ডের কাহিনী শুনলেই বুঝতে পারবে আমার কথা কতখানি সত্য। শুনতে শুনতে পথ হাঁটার পরিশ্রমও তুমি টের পাবে না।" বলে বেতাল কাহিনী শুরু করল: প্রাচীনকালে বসন্ত নগরের রাজা ছিলেন মদনবর্মা। লোকটা খুব আরামে কাটাত। রাজা হয়েও রাজ্যের কোন কাজ কর্ম নিজে দেখাশোনা করত না। সব সময় মদ্য পান করত আর বহু নারীকে কাছে রাখত। আনন্দ উপভোগ করত।

বেতাল কথা
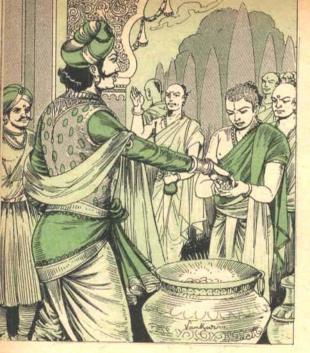
দেশ দেখাশোনার ভার মন্ত্রী ও সেনাপতি-দের উপর ছেড়ে দিয়েছিল। তারা স্বেচ্ছা-চারী হয়ে গিয়েছিল।

এসব সত্ত্বেও মদনবর্মার নাম অন্য দেশে মহা ধর্মাত্মা হিসেবেই ছড়িয়ে পড়েছিল। তার কারণ হল সেই রাজা বছরে দুবার খুব ঘটা করে যজ্ঞ করত। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মণ বিদায় করত অনেক কিছু দিয়ে। ব্রাহ্মণেরা নানান মূল্যবান জিনিস পেয়ে রাজাকে ভাল কথা বলে প্রশংসা করত। তাকে বুকভরা আশীর্বাদ জানাত। এই যজ্ঞ উপলক্ষে প্রচুর অর্থ খরচ করত। কোন হিসেব থাকত না। যজ্ঞের জন্য যা লাগত সব দেশের অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে আনা হত। দেশবাসীকে ফতুর করে দিয়েও জিনিস সংগ্রহ করত। যজ্ঞ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশে অকাল দেখা দিত।

দেখতে দেখতে দেশবাসীর অবস্থা ভয়াল রূপ ধারণ করল। এই ধরণের ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে গণ্ড নামে এক চোরের উপদ্রব ভীষণ বেড়ে গেল। নতুন নতুন পদ্ধতিতে সে চুরি করত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গণ্ডের নামে ভয়ে কাঁপত।

অন্য বছরের মত সে বছরও রাজা মদনবর্মা খুব খরচ করে যজ্ঞের ব্যবস্থা করল। দূর দূর থেকে ব্রাহ্মণরা এসে রাজার কাছ থেকে সোনাদানা নিয়ে বনপথে নিজের দেশে ফিরে যেতে লাগল।

রামশর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বনপথে চলার সময় ভয় পেয়ে জোরে জোরে শ্লোক উচ্চারণ করছিল। গণ্ড হঠাৎ তার সামনে হাজির হয়ে বলল, "দেশবাসী খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না, আর তোমরা যজ্ঞ করাচ্ছ? যজ্ঞ? বলি কার অর্থে এসব করছে রাজা? কার মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থে এসব করছে রাজা? তোমরা কি প্রজাদের কাছ থেকে জোর করে আদায় করা অর্থে ভাগ বসাচ্ছ না? একটা অকর্মণ্য অপদার্থ ভোগী রাজাকে তোমরা প্রশংসা করতে এসেছ? সমস্ত সোনাদানা যা কিছু

পেয়েছ ওখানে রেখে নিজের পথে চলে যাও। যাও। এ যাত্রা প্রাণে বেঁচে গেলে। ফের যদি আস প্রাণে মারা পড়বে।”

“বাবা তুমি যা বলছ আমি মেনে নিচ্ছি। তবে তোমরাও একবার ভেবে দেখো যা করছ ঠিক করছ কিনা। একটু চিন্তা করো।” বলল রামশর্মা।

“আমি অধর্ম দূর করছি। তাই আমি যা করছি তা অবশ্যই ধর্ম। এই রাজা কোন কাজ করে না। এর মন্ত্রী ও সেনাপতিরা প্রজাদের লুটেপুটে খাচ্ছে। ব্যবসাদাররা ইচ্ছেমত শোষণ করছে। আমি যতটা পারি এই রাজা ততটাও সক্ষম নয়।” বলল নাম করা চোর গণ্ড।

“তাহলে তোমরা এদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ধর্মস্থাপনা করছ না কেন ?” রামশর্মা গণ্ডকে প্রশ্ন করল।

“ধর্মস্থাপনা করতে গেলে গোটা দেশের ক্ষমতা হাতে পাওয়া চাই। তা আমার একার পক্ষে এই কাজ কি করে সম্ভব ?” বলল গণ্ড।

কেন সম্ভব নয় ? চেষ্টা করলেই সম্ভব হবে। ভাবতে হবে। ভেবে ঠিক করতে হবে কিভাবে কি করা যায়। কত বড় বড় রাজারা কি এক একটা চোর ডাকাত ছিল না প্রথম জীবনে ? চোর ডাকাতের যা ক্ষমতা থাকে তাতে সে ইচ্ছা করলেই রাজা হতে পারে।” বলল রামশর্মা।
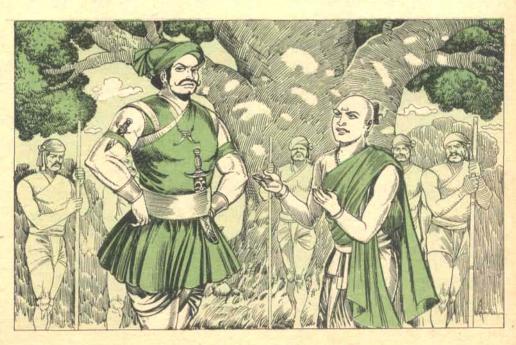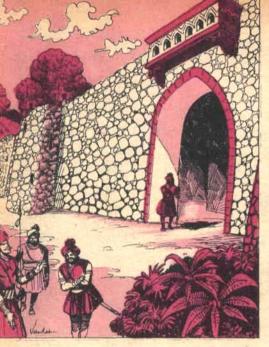
রামশর্মার কথা গণ্ডের মনে ধরল। এর আগে কোন দিন তার মাথায় এই ধরণের কথাতো খেলেনি। "তুমি আমাকে ভাল পরামর্শ দিয়েছ রাজা হয়ে ধর্মস্থাপনার। তুমি খুব গরিব ব্রাহ্মণ। তোমার জিনিস নিয়ে যাও।" বলল গণ্ড।

রামশর্মা বিরাট ফাঁড়া কেটে যাওয়ার মত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে চলে গেল।

গণ্ড সেই দিনই বসে গেল পরিকল্পনা করতে। দেশের অন্যান্য চোর ডাকাতদের নানা কৌশল প্রয়োগ করে মস্ত বড় একটা দল তৈরি করল। কেউ ভয়ে এল গণ্ডের অধীনে আবার কেউ এল কোন লোভে। গণ্ড সেনাবাহিনী গঠন করল তাদের দিয়ে।

তারপর রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ করে একের পর এক গ্রাম দখল করতে লাগল গণ্ড। দখল করা গ্রামের লোককে আশ্বাস দিল। তাদের কোন কিছুর অভাব থাকবে না। রাজকর্মচারিদের ভরসা দিল এই বলে যে তাদের চাকরি বহাল থাকবে। যে যে পদে আছে সে সেই পদেই থাকবে। এই ভাবে রাজার প্রভাব থেকে ঐ সব গ্রাম মুক্ত করল।

দেখতে দেখতে গণ্ড একটা ছোটখাট রাজা হয়ে গেল। মদনবর্মার কর্মচারীরা দেখল গণ্ডরাজাতো মন্দ নয়। ওরা আগে যা করত তাই করতে পারছে।

এদিকে মদনবর্মা যখন জানতে পারল যে তার রাজ্যের বেশ কিছু অংশে রাজা হয়ে বসে আছে গণ্ড। কি করে যে এত বড় একটা সর্বনাশ হল তা মদনবর্মা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না।

অনেক ভেবে চিন্তে শেষে মদনবর্মা নিজের সমস্ত সেনা নিয়ে গণ্ডের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গণ্ড জানত যে একদিন তাকে রাজার প্রচণ্ড আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে। তাই সে তার সৈন্যকে বনেই সুসজ্জিত রাখত। গাছের উপর থেকে, গাছের আড়াল থেকে কিভাবে শত্রুকে পরাজিত করতে হয় তার কৌশল নিজের সেনাকে শিখিয়ে দিল গণ্ড। গণ্ডের

বাহিনী চারদিক থেকে রাজার বাহিনীকে আক্রমণ করল। তীর ছুঁড়ে, আগুনের তীরে বিদ্ধকরে ছড়িয়ে দিল রাজার সেনাকে। তারপর এক এক সেনার উপর এক এক ধরণের অস্ত্র চালাতে লাগল গণ্ডের সেনারা। মদনবর্মার পরাজয় ঘটল ঐ বনের যুদ্ধে। তার বহু সৈন্য মারা গেল, হয় শিবিরেই নয় শিবিরের বাইরে। আর কালমাত্র বিলম্ব না করে পরের দিন ভোরেই গণ্ড রাজধানী আক্রমণ করে মদনবর্মার ছেলেকে বন্দী করে অনুষ্ঠান করে সিংহাসনে বসল। কারা যেন প্রশ্ন করল, "গণ্ড কোন জাতের লোক ? ক্ষত্রিয় না হলে কি রাজ সিংহাসনে বসতে পারে ?"

একথা কানে যেতেই রাজপুরোহিত বলল, "বীর গণ্ড হলেন অতি উত্তম স্তরের ক্ষত্রিয়। এঁর বংশ হল সূর্য বংশ। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের একশো আট সংখ্যক বংশধর। এঁর বংশ পরিচিতি আমার কাছে ছিল।" বলেই পুরোহিত তৈরি করে রাখা বংশসূচী পড়তে লাগল।

রাজপুরোহিতের কথা শুনে গণ্ড মনে মনে খুব খুশী হল। তার মনে হল সে সত্যি ক্ষত্রিয়। গোটা অনুষ্ঠানে ভাল ভাল কথা শুনে গণ্ডের মনে হল এই সিংহাসন ন্যায় সঙ্গতভাবে তারই প্রাপ্য।

তারপর গণ্ড তার ক্ষত্রিয় সেনাপতি ও মন্ত্রীদের কথামত চলতে লাগল। পাশের
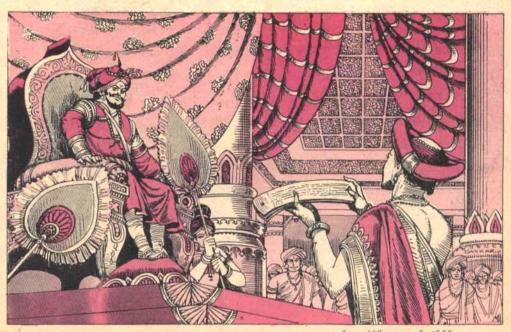
দেশের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের রাজ্যের কিছু কিছু অংশ দখল করে নিল।

"মহারাজ, এবছর আপনার এমন এক মহাযজ্ঞ করা উচিত যা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। "রাজপুরোহিত গণ্ডকে বলল। গণ্ড রাজা যজ্ঞ করার অনুমতি দিল।

রাজকর্মচারীরা সারা দেশ জুড়ে জোগাড় করতে লাগল যজ্ঞের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র। গ্রামে গিয়ে সাধারণ মানুষের শেষ সম্বল কেড়ে আনল ওরা। হাজার হাজার ব্রাহ্মণ খেয়ে দেয়ে উপহার নিয়ে ভাল ভাল শব্দ উচ্চারণ করে গণ্ডরাজাকে আশীর্বাদ করল। প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে? গণ্ডরাজারও ভাল লাগল।

ঐ সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে রামশর্মাও ছিল। গণ্ডের মনে হল লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে। চেনা চেনা লাগছে। রামশর্মা এগিয়ে এসে গণ্ডরাজাকে বলল, "মহারাজ, আমাকে চিনতে পারছেন? আপনি আপনার কথা রেখে ধর্ম রক্ষা করেছেন। আপনি যুগ যুগ ধরে রাজত্ব করুন। আমরা যেন আপনার ছত্রছায়ায় থাকতে পারি।"

রামশর্মার কথা শুনে গণ্ডরাজার মুখ ঝুলে গেল। সোজা অন্তঃপুরে ঢুকে গেল তাড়াতাড়ি উপহার বণ্টনের পালা শেষ করে। সেই রাত্রেই মদনবর্মার ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর আদেশ মন্ত্রীকে দিয়ে কালো রাত্রের অন্ধকারে একটা ঘোড়ায় চড়ে গণ্ড চলে গেল। পরের দিন মন্ত্রী ঘোষণা করল যে গণ্ডরাজা বিরক্ত হয়ে বনে গেছেন। মদনবর্মার ছেলেকে সিংহাসনে বসানোর নির্দেশ দিয়ে গেছেন। মদনবর্মার ছেলেকে সিংহাসনে বসানো হল।

কিছু দিনের মধ্যে আবার একটা খবর বেরুলো। বনে এক ভয়ঙ্কর ডাকাতের আবির্ভাব ঘটেছে। বড়লোকদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করে গরিবদের মধ্যে নাকি তা বণ্টন করবে। কথা রটতে লাগল। আরও জানা গেল যে সিংহাসন ছেড়ে যে গণ্ড বনে গেছে সেই এই লুণ্ঠনের কাজ করছে।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বিক্রমাদিত্যকে জিজ্ঞেস করল, "মহারাজ, যে গণ্ড ধর্মস্থাপনার জন্য সিংহাসনে বসতে চেয়েছিল সে সিংহাসনে বসে ধর্মস্থাপনা করল না কেন? কেন আবার লুণ্ঠনকারী হয়ে গেল? যে গণ্ড যজ্ঞের অত বিরোধী ছিল সে নিজে রাজা হয়ে কেন যজ্ঞ করল? এই প্রশ্নগুলোর সমাধান জানা সত্ত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।"

একথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, "অধর্ম রাখা বলবানের পক্ষে খুব সহজ কাজ। ধর্ম রক্ষা করতে হলে জনসাধারণের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। সবার সাহায্য ছাড়া ধর্ম রক্ষা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। গণ্ড অধর্মের মোকাবিলা করতে পারত। সে ভেবেছিল রাজা হয়ে অধর্ম দূর করে ধর্ম রক্ষা করতে পারবে। কিন্তু রাজা হওয়ার পর বুঝল যে রাজা কোন কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারে না। তাকে নির্ভর করতে হয় সেনাপতি, মন্ত্রী, পুরোহিত এবং আরও অনেকের উপর। তারা যতক্ষণ না কোন কিছুর বিরোধিতা করছে ততক্ষণ রাজার একার কোন কিছু করার সুরোদ নেই। তাই গণ্ড বুঝল যে তার পক্ষে ধর্মস্থাপনা করা সম্ভব নয়। এই সত্য উপলব্ধির পর সে আর এক মুহূর্ত সিংহাসনে বসেনি। সবাই মিলে ওকে বুঝিয়ে দিল যে যজ্ঞ ঘটা করে করা উচিত। এই যজ্ঞের বিরোধীতা করা তার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। গণ্ড তখন থেকেই বুঝতে পেরেছিল যে রাজা স্বাধীন নয়। তাই শেষে সে স্বাধীনভাবে বাঁচার পথ বেছে নিল।"

রাজার এইভাবে মৌনভাব ভঙ্গ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেতাল শব নিয়ে উধাও হয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল।

(কল্পিত)

পরীক্ষা

কাবেরীর তীরে শঙ্কর ভট্ট নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ছাত্রদের নিজের বাড়িতে খাইয়ে পরিয়ে পড়াতেন। তাঁর কাছে অনেক ছাত্র বেদ পাঠ শেষ করে ফিরে যেত।

জগন্নাথ নামে এক ছাত্র কিছুদিন খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করেছিল। তারপর শঙ্কর ভট্টের ধারণা হল জগন্নাথের মনযোগ বুঝি পড়াশুনায় কমে যাচ্ছে। তিনি বিষয়টি তাঁর স্ত্রীকে জানালেন।

"ওর লেখাপড়ায় যেদিন মন বসবে না আমি ঠিক টের পাব। তোমাকে সময়মত জানাব।" তার স্ত্রী জানালেন।

একদিন অন্য দিনের মতই জগন্নাথকে খেতে দিলেন শঙ্কর ভট্টের স্ত্রী। ভাত মুখে পুরেই জগন্নাথ বলল, "মা, ভাতে কি রেড়ির তেল দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ বাবা, আমি এত বছর তোমার ভাতে রেড়ির তেলই দিতাম। পড়াশুনায় তোমার গভীর মনোযোগ থাকায় তুমি তা টের পাওনি। এখন তোমার পড়া শেষ হয়েছে। তাই বুঝতে পেরেছ।" বললেন শঙ্কর ভট্টের স্ত্রী।

সেই দিনই শঙ্কর ভট্ট জগন্নাথকে তার নিজের বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

ধার আদায়

কোন এক দেশে সত্যচরণ নামে এক ধনী ছিল। দেশের বহু লোককে সে ধার দিত। ধার আদায় করার কৌশলও তার জানা ছিল। কোন লোক তার পয়সা মেরে দিতে পারত না।

একবার সোমনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ তার কাছে ধার চাইতে এসে ধার নিয়ে বলল, "আপনি কোন কাগজপত্রে কিছু লিখিয়ে নিলেন না, ব্যাপার কি? আমি যদি আপনার টাকা মেরে দি? আপনার তো কোন প্রমাণ নেই, কি করতে পারবেন?"

একথা শুনে সত্যচরণ একটু হেসে বলল, "আপনার মত লোকের কাছ থেকে আবার কাগজ লিখিয়ে নেব? কি দরকার আছে প্রমাণ রাখার। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে আপনার উপর। আর যদি মেরেই দেন মনে করব আমি এক ভিখিরীকে দান করেছি। আমার তা নিয়ে কোন দুঃখ থাকবে না। আমি মরে যাব না তাতে।"

সোমনাথ সত্যচরণের বিশ্বাসের গভীরতা দেখে অবাক হয়ে গেল। পরে যখন পারল তখন সুদ ও আসল সত্যচরণকে দিয়ে দিল।

সত্যচরণের বাড়ির কাছেই থাকত সুদেব নামে এক ধনী লোক। তার টাকা ছিল কিন্তু বুদ্ধি ছিল না। সুদেবের টাকার লোভ ছিল খুব বেশি। সুদের কারবার করে বেশি রোজগার করার ইচ্ছা জাগল তার। কিন্তু সে জানত না কিভাবে ধারের টাকা আদায় করতে হয়। সত্যচরণের কাছে ঐ কৌশল শেখার কথা ভাবল।

প্রদীপ দে
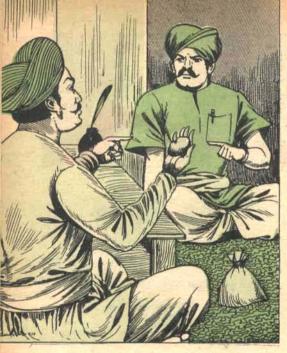
কিন্তু এক ধনী অন্য ধনীকে অর্থ উপার্জনের কৌশল শেখাবে কেন? তাই অনেক ভেবেও সুদেব ভেবে পেল না কিভাবে কি করবে। শেষে ঠিক করল নিজেই সত্যচরণের কাছে টাকা ধার করবে। সেই দিনই সত্যচরণের কাছে গিয়ে একশো টাকা ধার চাইল।

সত্যচরণ আকাশ থেকে পড়ার মত অবাক হয়ে বলল, "আমি আপনাকে ধার দেব? কি বলছেন?"

"আর বলেন কেন টাকা পয়সার ব্যাপারে কিছুই বলা যায় না। এই আছে, এই নেই। হঠাৎ অনেক টাকা দরকার পড়ে গেল। আর কার কাছেই বা যাই। তাই আপনার কাছেই চলে এলাম। আপনি ছাড়া এখানে আর কার বা ক্ষমতা আছে টাকা ধার দেবার।"

কিছুক্ষণ ভেবে সত্যচরণ বলল, "ঠিক আছে দিচ্ছি," বলে ভেতরে গিয়ে একশো টাকা ও একটি পাথরের টুকরো আনল। টাকা সুদেবের হাতে দিয়ে বলল, "এই পাথরটাকে দয়া করে ছুঁয়ে নিনতো।"

"কেন?" সুদেবের প্রশ্ন।

"এমনি। কোন ক্ষতি হবে না।" সত্যচরণ বলল।

সুদেব ঐ পাথরটাকে ছুঁয়ে টাকাটা ট্যাকে গুঁজে নিল। সত্যচরণ বলল, "সুদের হার মাসে দুটাকা।"

সুদেব বুঝতে পারল তার কাছে একটু বেশি সুদ চাওয়া হচ্ছে। তবু কোন কথা বলল না। কারণ তার উদ্দেশ্য সফল হতে চলেছে। সত্যচরণের কাছ থেকে আসল কৌশল শিখে নেবে।

মাসের পর মাস কেটে গেল কিন্তু সত্যচরণ তাকে তাগাদা দিতে আসেনি। কেন যে আসছে না ভেবে অস্থির হয়ে উঠল সে। শেষে পাঁচ মাস পরে সুদেব সত্যচরণেব কাছে এসে বলল, "কি মশাই, এত মাস হয়ে গেল, কোই তাগাদা দিতেতো এলেন না? আমাকে যে ধার দিয়েছেন তা ভুলে গেলেন নাকি একেবারে?"

"আমি ভুলে যাব কেন? যত দেরি হবে আমার সুদ তত বাড়বে। লাভ আমারই বেশি।" বলল সত্যচরণ।

কথাটা শুনেই সুদেব বলল, "বেশ বলেছেন। আর আমি যদি না দি? মেরে দিলে কি করবেন? আপনি তো লিখিয়ে নেন নি।"

"আপনি আমার টাকা মারতে পারেন না। টাকা নেবার সময়, মনে আছে আপনি একটি পাথর ছুঁয়ে ছিলেন? ঐ পাথর যাঁরা ছুঁয়েছেন তাঁরা কেউ আমার টাকা মারতে পারেনি।" সত্যচরণ বলল।

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সুদেব ভাবল তাহলে ঐ পাথরটাই কৌশলের মূল অস্ত্র। ওটাকে হাতাতে পারলে আর কোন কিছুর দরকার হবে না।

সুদেব বলল, "তাই বুঝি?" মুহূর্তকাল ভেবে সুদেব বলল, "আচ্ছা দাদা, আমি কিছুতেই অনেক চেষ্টা করেও কিছু লোকের কাছ থেকে আমার আদায় করতে পারছি না। দয়া করে আপনার এই পাথরটা কিছুদিনের জন্য যদি আমাকে ধার দেন তাহলে আদায় করে অনেক টাকা উদ্ধার করে নিতে পারি। আপনার পাথর অবশ্যই ফেরত দেব।"

"ঠিক আছে নেবেন। আমার কাছে দুটো পাথর আছে। আপনি একটা নিয়ে

নিন। আপনি পাথরটা আপনার কাছে এক বছর রেখে দেখুন। যদি কাজ না হয় এক বছর পরে ফেরত দেবেন, আপনার টাকা আপনাকে ফেরত দেব।"

সুদেব নিজের পরিকল্পনা মত কাজ হওয়ায় পরমানন্দে বলল, "এর দাম কত?"

"একশো দশ টাকা।" সত্যচরণ বলল।

সুদেব বাড়ি থেকে একটা টাকার থলি এনে তার হাতে দিয়ে বলল, "যত টাকা বাড়িতে এই মুহূর্তে আছে ভেবেছিলাম তত টাকা নেই। মাত্র একশো দশ টাকাই আছে। এই টাকা নিয়ে আপাতত ঐ পাথরটা দিন, পরে ধারের টাকা আপনাকে সুদ সমেত ফেরত দেব।"

"আপনার যা ইচ্ছা। দেরি হলে আমারই তো ভাল। সুদ বেশি পাব।" বলে টাকা নিয়ে ঐ পাথর দিয়ে দিল সত্যচরন।

পাথর নিয়ে সুদেব দেশের বহু লোককে টাকা ধার দিতে লাগল। টাকা ধার দেয় আর পাথর ছুঁতে বলে। লোকে তাই করে টাকা নেয়। সুদেব নিশ্চিন্তে টাকা ধার দিয়ে যায়। পাথর যখন ছুঁয়েছে তখন ওরা টাকা সুদ সমেত না দিয়ে পারবে না। এই তার ধারণা।

মাসের পর মাস কেটে গেল। লোকে সুদেবের কাছে শুধু টাকা নিতেই আসে, দিতে আসে না। আট নয় মাস হয়ে গেল অথচ টাকা ফেরত পাচ্ছে না দেখে সুদেব সত্যচরণের কাছে গিয়ে বলল, "কি হল পাথর ছুঁয়ে যারা টাকা নিয়ে গেছে তারা কেউ আর ফিরছে না কেন?"

"পুরো এক বছর দেখুন।" সত্যচরন হাসিমুখে বলল।

এক বছর হয়ে গেল কিন্তু টাকা আর ফেরত দিয়ে গেল না। ঘরের টাকাই ঘরে ফিরল না, সুদের টাকা তো পরে। সুদেব টাকা দিয়ে ফতুর হতে চলল। শেষে এক দিন রেগেমেগে সত্যচরণের সামনে পাথর-টাকে ছুঁড়ে ফেলে সুদেব বলল, "সব ধোকাবাজী। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দিলাম কেউ ফেরত দিয়ে গেল না।"

"আমার কাছে যখন ছিল তখন তো বেশ কাজ পেয়েছিলাম।"

"ছাই কাজ পেয়েছেন! আমাকে যা দিয়েছিলেন তা কি ফেরত পেয়েছেন? আপনার পাথরে কোন গুণ নেই।"

"আপনার কাছ থেকে টাকা আদায় করতে পারিনি কে বলল? সুদ সমেত আদায় হয়ে গেছে সেই এক বছর আগে। ঐ পাথরটা ফাউ হিসেবে দিয়েছিলাম। আপনার দেয়া একশো দশ টাকা ধার শোধ বাবদ খাতায় জমা করে নিয়েছি।" বলল সত্যচরন।

তাজা মাছ

একটি মাছের দোকানের সামনে সাইনবোর্ডে লেখা ছিল : 'এখানে তাজা মাছ বিক্রি হয়।' অনেকেই এসে কিনে নিয়ে যাচ্ছিল। একজন ক্রেতা একটা তুলে নিজের মুখের কাছে ও কানের কাছে মাছটাকে ধরে সেটাকে রেখে দিল। তা দেখে মাছ বিক্রেতা বলল, "দাদা, এখানে পচা মাছ বিক্রি হয় না। লোকে মাছটাকে নাকের কাছে রেখে শুঁকে দেখে আপনি কি যে করলেন বুঝলাম না।" "আমি শুঁকিনি। মাছের সঙ্গে কথা বলেছি।" বলল ঐ ক্রেতা। তার কথা শুনে যারা এসেছিল সবাই অবাক হয়ে গেল। তার দিকে বার বার তাকাতে লাগল।

"তাই নাকি ? আপনি কথা বলেন ? তা মাছ আপনাকে কি বলল ?" মাছ বিক্রেতা জিজ্ঞেস করল।

"বলল, আরে মশাই আমি তিন দিন আগে গঙ্গা থেকে উঠে এসেছি। তাজা খবর আমি আপনাকে দেব কোত্থেকে ? এই কথাই মাছটা বলল।" ঐ ক্রেতা বলল।

তার কথা শুনে সেখানে যারা ছিল প্রত্যেকে হো হো করে হেসে উঠল। আর মাছ বিক্রেতা লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল।

চোখে-না-পড়া দৃশ্য
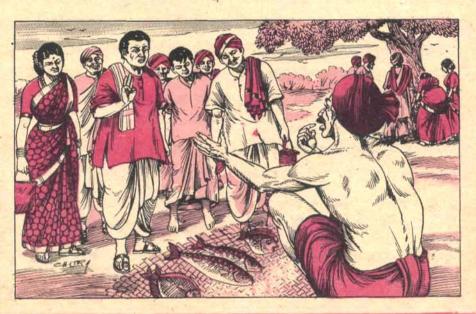
গঙ্গার তীরবর্তী এক অঞ্চলে নারায়ন শাস্ত্রী নামে এক মুনি ও অয়নকুমার নামে তাঁর এক শিষ্য ছিলেন। একবার পথ চলতে চলতে নারায়ণ শাস্ত্রী একটি গাছতলায় বসে শিষ্যকে এক ঘটি জল আনতে পাঠান। অয়নকুমার জলের খোঁজে বেরিয়ে দূরে একটা লোককে বসে খাওয়ার আয়োজন করতে দেখতে পেল। শিষ্য ভাবল তার কাছ থেকে জল নেবে অথবা কোথায় পাওয়া যায় তার খোঁজ নেবে। এসব ভেবে অয়নকুমার ঐ গাছ তলায় বসা লোকটার দিকে এগোতে লাগল।

তাকে দেখে গাছ তলায় খেতে বসা লোকটা তাড়াতাড়ি সব গুটিয়ে সেখান থেকে সরে পড়ল। নিজের জন্য আনা খাবার অন্যকে দিতে হবে ভেবে লোকটা চলে গেল বলে মনে হল অয়নকুমারের।

হাঁকপাক করে পালাতে গিয়ে তার ঘটির জল গড়িয়ে পড়ে গেল। লোকটার কাণ্ড দেখে শিষ্যের হাসি পেল। সে তখন এদিক ওদিক ঘুরে জল যোগাড় করে সেই পথেই ফিরল। ফেরার পথে সে একটি শব দেখতে পেল। পাশেই পড়ে ছিল খাবার। ঐ খবোর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পশু-পাখি খাচ্ছিল। লক্ষ্য করে শিষ্য দেখল এ সেই লোক। এই লোকটাই তাকে দেখে ছুটে পালিয়েছিল। হয়ত তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে খাবার আটকে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে। পাশেই পড়ে ছিল ঘটি। অয়নকুমার ভাবল, ভালই হয়েছে মরেছে। যেমন পালিয়েছিল তাকে দেখে তেমন ফল পেয়েছে। একটু জল দেবার ভয়ে কিভাবে পালাল! গুরুকে সবিস্তারে শিষ্য বলল।

তৃপ্তি ভট্টাচার্য

"তাহলে তো ঐ শব ঐ ভাবে ফেলে রাখা উচিত হবে না। চল আমাদের কর্তব্য আমরা করে আসি।" বলে নারায়ণ শাস্ত্রী সেই শবের কাছে এলেন। গুরুর নির্দেশ মত শিষ্য শুকনো কাঠ আর আগুন জোগাড় করল।

চিতা জ্বলে উঠলে আকাশের দিকে তাকিয়ে নারায়ণ শাস্ত্রী বললেন, "বা, চমৎকার, লোকটা স্বর্গে পৌঁচেছে। আমার ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।"

গুরু যেদিকে তাকিয়েছিলেন অয়নকুমার সেদিকে তাকিয়ে কিচ্ছু দেখতে পেল না। সে বলল, "অতিথিকে সামান্য খাবারের ভাগ দেবার ভয়ে যে লোকটা ছুটে পালায় সে হল গিয়ে স্বর্গযাত্রী। এতো চমৎকার কাণ্ড! আর আপনিই বা ছুটে এসে দাহ করতে এগিয়ে এলেন কেন?"

"সে যা পাপ করেছিল সব মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়েছে। মানুষ অজান্তেও তো পূণ্য করে থাকে। যেমন, মারা যাওয়ার সময় তার অজান্তেই তার খাবার পশু-পাখিরা খেয়েছে।

এই একটি কারণের উপর ভিত্তি করেই আমি চেয়ে ছিলাম লোকটাকে স্বর্গে পাঠাতে। আমার কামণা পূর্ণ হয়েছে। আমি তা দেখেছি নিজের চোখে।" বলল নারায়ণ শাস্ত্রী।

"তাহলে আমি দেখতে পাইনি কেন?" বলল অয়নকুমার।

"একটা গল্প বলছি। শুনলে বুঝতে পারবে কেন তুমি দেখতে পাওনি। বলছি।"

অনেক বছর আগে কুমারিলভট্ট নামে এক জ্ঞানী লোক ছিলেন। বেদভিত্তিক কর্মানুষ্ঠানে তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তখনকার দিনে বৌদ্ধরা বেদমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। তাদের মত খণ্ডন করতে হলে, ঐ মতের বিরুদ্ধে প্রচার করতে হলে, ওদের মতটা ভালভাবে জানতে হবে। এই উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুর পোশাক পরে বৌদ্ধ বিহারে ঢুকে ওদের মত জানার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই বৌদ্ধরা বুঝতে পারল যে উনি কেন ওদের মধ্যে আছেন। তখন যেহেতু প্রাণে মারা ওদের মতে পাপ অতএব ওরা তাঁকে সাত তলা বাড়ির উপর থেকে নিচে ফেলে দিল। নিচে পড়তে পড়তে কুমারিল ভট্ট বললেন, "বেদ যদি সত্য হয়, আমি আঘাত না পেয়ে নিচে পড়ব নিরাপদে।" ঠিক তাই হল। তাঁর কোন আঘাত লাগল না। তবে তাঁর চোখে একটি পাথর ঢোকায় অনেক দিন কষ্ট পেয়েছিলেন।

বেদের প্রতি গভীর বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও কেন যে চোখে আঘাত পেলেন তাঁর গুরুর কাছে জানতে চাইলেন। গুরু এ কথার জবাবে বললেন, "তুমি বেদের প্রতি গভীর বিশ্বাস না রেখে 'বেদ যদি সত্য হয়' বলাতেই, এইভাবে সন্দেহ প্রকাশ করাতেই পাথর ঢুকল চোখে। তা না হলে ঢুকত না। 'বেদ সত্য বলেই আমি আঘাত পাব না' বললে কোন বিপদ ঘটত না।" বললেন কুমারিল ভট্টের গুরু।

নারায়ণ শাস্ত্রী এই কাহিনী শুনিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বুঝতে পেরেছ তো আমি যে দৃশ্য দেখেছি সেই দৃশ্য তুমি কেন দেখতে পেলে না?" অয়নকুমারকে জিজ্ঞেস করলেন।

ঐ পুণ্যাত্মার ঘটনার সঙ্গে এই পাপাত্মার ঘটনার কোথায় যে মিল তা বুঝতে পারলাম না তো!" বলল শিষ্য।

"তাহলে তোমাকে আর একটি কাহিনী শোনাচ্ছি শোন। সেটা শুনলে বুঝতে পারবে কোথায় মিল।" বললেন নারায়ন শাস্ত্রী। তিনি বললেন ঃ সুনন্দ নামে এক ভক্ত একজন যোগীর কাছে নরসিংহ মন্ত্র শেখার উদ্দেশ্যে বনে গিয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। সেই সময় এক ব্যাধ তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "এদিকে একটা হরিণ এসেছে ?"

"ধ্যানে বসে আছি দেখব কি করে ?"

"তুমি কে, এখানে কেন এভাবে বসে আছ ?" জিজ্ঞেস করল ঐ ব্যাধ।

ব্যাধকে সহজ ভাষায় বোঝানোর জন্য সুনন্দ বললেন, "আমিও তোমার মত এক-জন শিকারী। আমিও একটি মৃগের সন্ধানে এখানে বসে আছি।"

"তাই নাকি ? কেমন দেখতে সেটা ?" ব্যাধের প্রশ্ন। সুনন্দ নরসিংহ অবতার ভালভাবে বর্ণনা করে বোঝাল।

"বনে যত রকমের মৃগ আছে প্রত্যেক-টাকে আমি চিনি, কিন্তু তুমি যে রকমটা বলছ ওরকমের মৃগ আমি দেখিনি।" বলল ঐ ব্যাধ।

"আছে নিশ্চয়, তুমি দেখতে পাও না।" বললেন সুনন্দ।

"আপনি জ্ঞানী পুরুষ আপনি যখন বলছেন আছে, তাহলে নিশ্চয় আছে। ঠিক আছে আমি ধরে আনছি।" একথা বলে
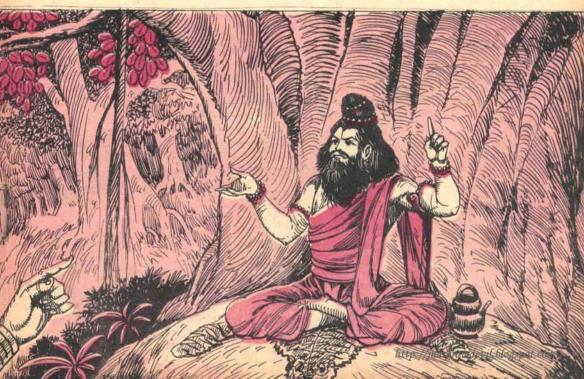
ব্যাধ ভাবতে ভাবতে বনের দিকে এগিয়ে গেল। জ্ঞানীর কথা বিশ্বাস করে সে সমস্ত বন তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু কোথাও ঐ ধরণের মৃগের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। শেষে কথা রাখতে না পারার দুঃখে সে যখন আত্মহত্যা করতে যাবে এমন সময় নরসিংহ ব্যাধের উপর প্রসন্ন হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তার সামনে অর্দ্ধেক নর অর্দ্ধেক সিংহ মূর্তির একটি মৃগ দেখতে পেল ঐ ব্যাধ। তখন সে মনে মনে ভাবল জ্ঞানী তো তাকে ঠিকই বলেছেন।

ব্যাধ যে দড়ি নিজের গলায় পরবে ঠিক করেছিল সেটা দিয়ে নরসিংহকে ভাল করে বেঁধে সুনন্দের কাছে এনে বলল, "এই যে আপনি যে মৃগ খুঁজছিলেন আমি তা ধরে বেঁধে এনেছি।" বলে ঐ মৃগকে সামনে এনে দেখাল। সুনন্দ তার সামনে কিছুই দেখতে পেল না। শুনতে পেল ঃ "গুরুর কথা তুমি বিশ্বাস করনি। খোঁজার মত খুঁজলে যে আমাকে পাওয়া যায় তা তুমি বিশ্বাস করনি। তাই তুমি ভেবেছ ব্যাধ খুঁজে পাবে না আমাকে। মনে রেখো তোমার ধ্যানের চেয়ে ব্যাধের বিশ্বাস অনেক বেশি।"

সুনন্দ ব্যাধকে বললেন, "তুমি বিশ্বাস করেছ, পেয়েছ, আমি ধ্যানে বসেও পাইনি।"

"এবার বুঝতে পেরেছ?" বললেন নারায়ণ শাস্ত্রী।

"আজ্ঞে হ্যাঁ এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। ঐ লোকটা পাপী হলেও তাকে স্বর্গ পাইয়ে দেবার জন্য আপনি দৃঢ় বিশ্বাসে কাজ করেছেন। সেইজন্য ঐ লোকটার স্বর্গে যাওয়া আপনি দেখতে পেলেন আর আমার মনে আপনার মত বিশ্বাস দৃঢ় না থাকায় আমি দেখতে পাইনি।" বলল অয়নকুমার।
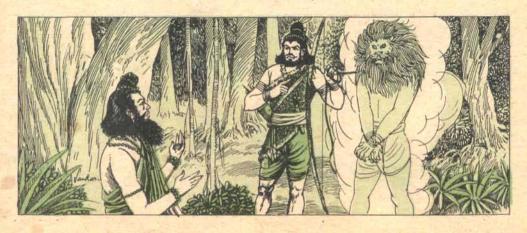
ধোকা খায় কেন ?

প্রাচীনকালে কোন এক রাজার মনে একটা প্রশ্ন জাগল, অনেক বড় বড় জ্ঞানী লোকও ধোকা খায় কেন ?

রাজা অনেককে এই প্রশ্ন করলেন, কেউ রাজার মনের মত জবাব দিতে পারেনি। শেষে রাজা ঘোষণা করলেন, "যে আমার প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে পারবে তাকে আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব দেব।" বাজে লোক যাতে না আসে তার জন্য রাজা ঘোষণা করলেন, "যে সঠিক জবাব দিতে পারবে না তার গর্দান যাবে।"

এক যুবক রাজার কানে কানে বলল, "মহারাজ, আমি আপনার পাশের দেশের রাজার অঙ্গরক্ষক। যদি তাকে পরাজিত করতে চান তাহলে কাল আমার রাজা বনপালকেশ্বরীর পুজো দিতে বনে আসবেন। ঐ রাজা আমার ভাইকে বিনা অপরাধে বধ করেছিলেন। আপনি তাকে বধ করলে আমি প্রতিশোধ নেবার আনন্দ পাব আর দাদার আত্মা শান্তি পাবে।" রাজা খুব খুশী হয়ে পরের দিন বনে ঢোকার কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ চারজন লোক রাজাকে জাপটে ধরল। রাজা চিৎকার করে বলে উঠল, "আমাকে ধোকা দিয়েছে! ধোকা! ধোকা!"

"ক্ষমা করবেন মহারাজ! আমি আপনার প্রজা। মানুষ লোভ ও দুরাশার জন্যই ধোকা খায়। সেটা প্রমাণ করার জন্যই।" বলল ঐ যুবক।

রাজা ঐ যুবককে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়ে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।

যোগ্য লোক

কোন এক গ্রামে এক কিপটে জমিদার ছিল। কোন চাকর দশ দিনের বেশি টিকতে পারত না। কাজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন অজুহাতে তাকে দূর করে দিত। তার পয়সাও মেরে দিত।

তার বাড়িতে রামু নামে এক চাকর তার বাপের আমল থেকে ছিল। তাকে টাকা পয়সা কম দিক বেশি দিক কাজ করে যেত। রামু যা পেত তাতে কোন ক্রমে তার সংসার চলত। কষ্ট করে পেটে গামছা বেঁধে ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটাত।

একবার কি এক অজুহাতে রামুর মাস মাহিনা জমিদার দিল না। ফলে তার স্ত্রী ও ছেলের খুব রাগ হল। রামুর ছেলে ভীমের বয়স চোদ্দ। ভীমের কাছে এত বড় অন্যায় অসহ্য লাগল। সে বাবাকে বলল, "বাবা তোমাকে আর কাজে যেতে হবে না। আমি যাব জমিদারের বাড়িতে কাজ করতে।" কাজ করতে গেলে জমিদার তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেরে তুই ?"

"আমি রামুর ছেলে ভীম।" ভীম বলল।

"তোর বাবা কাজে আসেনি কেন ?"

"আজ থেকে বাবার কাজ আমি করব। আমি মাত্র এক মাস কাজ করব আপনার কাছে। তারপর চলে যাব। মাস পুরোলেই আমাকে মাহিনা দিয়ে ছুটি দিয়ে দেবেন। আমি কিন্তু আর থাকব না।" ভীম বলল।

জমিদার কি ভেবে খুব খুশী হল। এক মাস তাকে খুব খাটিয়ে নিতে পারবে। যে কোন অজুহাতে তার মাহিনা মেরে দেবে।

জমিদার বলল, "দেখ, ভীম, আমি যা করতে বলব তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

চাই। তাতে যদি রাজী থাক কাজে যোগ দাও তা না হলে সরে পড়।"

ভীম তাতে রাজী হয়ে গেল। তখন জমিদার ভাবল ভীম যা করতে পারবে না এমন কাজ তার উপর চাপিয়ে দিলে সে নিশ্চয় অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারবে না। আর তখন সেই অজুহাতে মাস শেষ হলেই তাকে বিনা মাহিনায় ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে। এসব ভেবে জমিদার তাকে ভুট্টার ক্ষেত দেখতে বলল।

এক মাস হয়ে এল। ভুট্টার শিষ ধরে গেছে। একদিন ক্ষেত দেখতে এসে জমিদার ভীমকে বলল, "দেখ ভীম প্রত্যেকটা চারা আমি লক্ষ্য করে দেখেছি। আমি চাই প্রত্যেকটাতে হয় একটা করে থাক অথবা দুটো করে থাক। অবশ্য দুটো করে থাকলেই খুশী হব।" বলে জমিদার চলে গেল। সে মনে মনে ভাবল দারুণ একটা প্যাঁচে ফেলতে পেরেছে। ভীম এর কোন সমাধান করতে পারবে না। অতএব মাহিনাও দিতে হবে না।

ভীম মনে মনে হাসল। দু-তিন দিন বাদে জমিদার আবার এল ভুট্টার ক্ষেত দেখতে। আশ্চর্য হয়ে দেখল প্রত্যেকটা গাছে দুটো করে শিষ উঠেছে। দুটো করে ভুট্টা দেখা দিয়েছে। জমিদার কিছুক্ষণ ভাবতেই পারল না ভীম কি করেছে। কি করে প্রত্যেকটা গাছে দুটো করে ভুট্টা গজিয়ে তুলেছে। পরক্ষণে জমিদার ক্ষেত দেখে ফাঁকা ফাঁকা থাকাতে বুঝতে পারল ভীম কী কাণ্ড করেছে। কিন্তু বলার কিছু নেই। কারণ জমিদার হিসেবে সে নিজেই দেখতে চেয়েছে দুটো করে ভুট্টা প্রত্যেকটা গাছে। অনেক ভেবে জমিদার বলল, "একি দেখছি ভীম। এতো অস্বাভাবিক ব্যাপার। ভুট্টার কোন ক্ষেতে কি কখন দুটো করে ভুট্টা প্রত্যেকটা গাছে দেখতে পেয়েছ ? তুমি এমন কিছু কর যাতে আর চারটে ক্ষেতের মত আমার ক্ষেতেও হয়। অস্বাভাবিক কিছু হলে ভাল দেখায় না।" জমিদার একথা বলে চলে গেল।
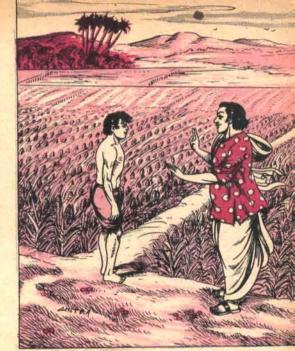
পরক্ষণেই ভীম কয়েকটা ভুট্টা তুলে নিল। সেগুলোও শহরে নিয়ে গিয়ে যথা-রীতি বিক্রি করে দিয়ে এল।

পরের দিন ক্ষেত দেখতে এসে জমিদার প্রত্যেকটা গাছে একটা করে ভুট্টা দেখতে পেল। তৎক্ষণাৎ তেলে বেগুনে চটে গিয়ে বলল, "বদমাইশ, পাজী কোথাকার, তুমি এইভাবে আমার ক্ষতি করার তালে আছ। তুমি রাতারাতি কয়েকটা গাছ থেকে ভুট্টা সরিয়ে ফেললে। দাঁড়াও আমি কেস করে তোমাকে জেলে পাঠাব।"

"কেস করতে চান করুন কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। আপনার শর্ত ছিল কি মনে আছে ? আপনি যা বলবেন আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাব।" কথাটা বেশ জোরের সাথে বলল ভীম।

ভীমের যুক্তি শুনে জমিদার কি করবে ভেবে পেল না। তাছাড়া কেস করতে গেলে সবাই জেনে যাবে যে আমি অনেককে খাটিয়ে পয়সা দিইনি। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বে। থাক যা হয়েছে, হয়েছে। এসব ভেবে জমিদার আর ভীমের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে ফিরে গেল।

পরের দিন ভীম জমিদারের বাড়ি গেল। হাতে করে নিয়ে গেল একটা থলি।

"বাবু এই যে ভুট্টা বিক্রির টাকা। এতে যে টাকা আছে তাতে বাবার প্রাপ্য মাস-মাহিনা ও আমার এক মাসের মাহিনা হয়ে যাবে।" বলে তার সামনে থলিটা রাখল।

জমিদারের কাছে ভীম নিজের সততার একটা প্রমাণ দিল।

"দেখ ভীম, এই এতদিনে একটা মনের মত লোক পেয়েছি। আমি ঠিক তোমার মত বুদ্ধিমান চাকরকেই খুঁজছিলাম। আজ থেকে তুমি আমার বাড়িতে পাকাপোক্ত ভাবে থাকবে। আমি প্রত্যেক মাসে ঠিক সময়ে তোমার প্রাপ্য টাকা দেবই।" জমিদার সানন্দে বলল। ভীম ঐ চাকরি নিল।

ভুলো মনের জামাই

কোন এক দেশে এক ছিল ভুলো মনের লোক। নাম তার নবকুমার। বাচ্চা বয়স থেকে তার কোন কিছুই মনে থাকে না। এ হেন এক ছেলেকে পাত্র হিসেবে বাছাই করল পাশের গ্রামের একটা হতবুদ্ধি লোক।

পরের বছর জামাইষষ্ঠীর কদিন আগে শ্বশুরমশাই জামাই আর মেয়েকে ষষ্ঠীতে যেতে নেমন্তন্ন করে গেল। বার বার বলে গেল তারা যেন সকাল সকাল যায়।

শ্বশুরের যাওয়ার পরমুহূর্তেই নবকুমার ভুলে গেল শ্বশুরমশাই কেন তার বাড়িতে এসেছিল। "আচ্ছা, বাবা কেন এসেছিলেন বলত ?" নবকুমার জিজ্ঞেস করল বউকে।

"পোড়া কপাল আমার। এর মধ্যেই ভুলে গেলে ? জামাইষষ্ঠীতে আমাদের দুজনকে নেমন্তন্ন করে গেলেন।" বউ বিরক্ত হয়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বলল।

ষষ্ঠীর দিন স্বামী-স্ত্রী দুজনে বেরুনোর জন্য খুব ভোরে উঠল। "নিজেদের গরুর গাড়ীতে করেই যাব। গাড়ী ঠিক করতে বল।" বউ বলল।

খিড়কির দরজায় রাখা গরুর গাড়িটাকে বাড়ির সামনে এনে গাড়িতে বিচুলি পেতে আরাম করে বসার ব্যবস্থা করে নিল। ঠিক বেরুনোর মুহূর্তে তালা খুঁজে পাওয়া গেল না। "ভুলো মন তোমার কোথায় ফেলে রেখেছ এখন খোঁজ। আমি আর কি বলব।" গর্জে উঠল নবকুমার।

বউ সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল কিন্তু পেল না। শেষে রেগে গিয়ে বলল, "থাম তোমাকে আর খুঁজতে হবে না। আমি

সুবীর পাহাড়ী

খুঁজছি।" বলে নবকুমার হাতের জিনিসটা রেখেই দেখে ঐটাই তালা! আবার কোথাও ভুলে যাবে ভেবে হাতে ঐ তালা নিয়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বউ বলল, "মরণ আমার, হাতের তালা কি হাতেই থাকবে না কি লাগাবে!"

তালা লাগানোর পর পথে বেরিয়ে দেখে গাড়ি আছে বলদ নেই। বলদগুলো চাকর ক্ষেতে নিয়ে গেছে প্রত্যেক দিনের মত। তাকে কোন কথা জানানো হয়নি।

অন্য কোন উপায় না থাকায় ওরা ঘোড়া গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ল। গাড়িতে বসে নবকুমার বলল, "আমাদের বলদগুলো আজ কত জোর ছুটছে দেখেছ?"

"তোমার হাতে তুলে না দিয়ে বাবা-মা আমার গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ফেলে দিলেই পারত। গাড়িতে বসেই ভুলে গেলে যে এটা ঘোড়ার গাড়ি!" পাশের গ্রামে যেতেই ওদের দুপুর হয়ে গেল। নবকুমার গাড়ি থেকে নেবেই ছুটল শ্বশুরের বাড়ি। পেছন পেছন কোচওয়ান চিৎকার করতে করতে বলতে লাগল, কোই আমার ভাড়া দিন। ভাড়া!" কথাটা শ্বশুরের কানে যেতেই ও বেচারা ভাড়া দিয়ে দিল। তারপর জামাই-শ্বশুরে কথাবার্তা হল। কিছুক্ষণ পরে শ্বশুর ভেতরে গিয়ে খোঁজ করল জলযোগের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা। ফিরে এসে দেখে জামাই নেই! তাড়াতাড়ি বাড়ির বাইরে এসে শ্বশুর দেখল জামাই ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে চলে যাচ্ছে।

"নবকুমার, ও নবকুমার, নব!" শ্বশুরের ডাক শুনে জামাই চিৎকার করে বলল, "বাড়িতে আপনার মেয়ে একা আছে। আমি না থাকলে ও এক মুহূর্ত বাড়িতে থাকতে পারে না। ও ভীষণ ভীতু। আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।" দেখতে দেখতে শ্বশুরের নাগালের বাইরে চলে গেল নবকুমারের গাড়ি।

স্বর্গপ্রাপ্তি

একজন জগৎ সংসারের সমস্ত আনন্দ ভোগ করে উত্তম লোকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তপস্যায় মগ্ন হলেন।

আর একজন জগৎ সংসারের প্রতি বিরক্তি ধরায় বনে গেলেন। সেখানে প্রথমজনকে তিনি দেখতে পেলেন।

তপস্যারত লোকটার সেবা করে স্বর্গ-প্রাপ্তির আশা পোষণ করে প্রথমজনকে বললেন, "প্রভু, আপনি আমাকে আপনার শিষ্য করে নিন।"

"আমি কারো সেবা চাই না। আমাকে বিরক্ত করো না।" বলে প্রথম তাপস চোখ বুজলেন।

"এই মহাতাপসকে তপস্যায় ভঙ্গ না দেওয়াই একটা বড় ধরণের সেবা।" ভেবে দ্বিতীয় জন অদূরে তপস্যা করতে বসলেন।

তপস্যা করতে বসলেও দ্বিতীয়জন নজর রাখলেন প্রথমজনের উপর। কোন পশু বা পাখি তাঁর কাছে এলেই উঠে তাড়িয়ে দিতেন। প্রথমজন দ্বিতীয়জন কাকে তাড়াচ্ছে কি করছে কিছু না দেখে, কোন শব্দে কান না দিয়ে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন।

একদিন ঐ জায়গায় এল এক ধোপা। সে ওখানকার একটা পুকুরের জল ভাল আছে দেখে কাপড় কাচতে শুরু করে দিল। ওর সশব্দে কাপড় কাচার ফলে দুজনেরই তপস্যা ভঙ্গ হয়ে গেল। প্রথম-জন চোখ খুলে ধোপাকে দেখে ওকে দূরে চলে যেতে বলবেন ভেবেও বলেননি। আবার তপস্যায় বসলেন। কারণ তাঁর ধারণা হল ধোপাকে চলে যেতে বললে হয়ত খারাপ হবে।

অজিত সরকার

কিন্তু দ্বিতীয়জন রেগেমেগে উঠে ধোপাকে বললেন, "ওরে এই, তোর কি বুদ্ধি বলে কিছু নেই! এখানে কাপড় কাচাকাচি করে একজনের তপস্যায় বিঘ্ন সৃষ্টি করছিস? যা এখান থেকে।" চিৎকার করে বললেন দ্বিতীয়জন।

দ্বিতীয় তপস্বীর সঙ্গে প্রত্যেকদিন ধোপার ঝগড়া লাগত। ধোপা তাঁর কথাগুলো একান দিয়ে শুনে ওকান দিয়ে বের করে দিত। সে ঐ পুকুর ছাড়ল না।

কয়েক বছর পরে ঐ ধোপা মারা গেল। তার কিছুদিন পরে দ্বিতীয় তাপসও মারা গেল। আরও কিছুকাল পরে প্রথম তাপস দেহরক্ষা করে স্বর্গে গেলেন। যাওয়ার পথে দ্বিতীয় তাপসকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে দেখে দাঁড়াতেই দ্বিতীয় তাপস বললেন, "প্রভু, আমাকে আপনি স্বর্গে নিয়ে যান। আমি আপনার তপস্যা যাতে ভঙ্গ না হয় তার জন্য কত চেষ্টা করেছি।"

প্রথমজন স্বর্গে পৌঁছে দেখলেন ধোপা সেখানে রয়েছে। তা দেখে তাঁর সঙ্গে থাকা দেবদূতকে প্রশ্ন করলেন, "আমার সঙ্গে যিনি তপস্যা করলেন তিনি গেলেন নরকে আর আমার তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য যিনি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন তিনি এলেন এই স্বর্গে? এসব আমার কাছে খুব আশ্চর্য ঠেকছে!"

জবাবে দেবদূত বললেন, "এই ধোপার জন্যই তোমার তপস্যা গভীরতর হয়েছে। তপস্যার ফল ত্বরান্বিত হয়েছে। ধোপা অত শব্দ না করলে তোমার একাগ্রতা বাড়তো না। এই ধোপা ধর্মপথে চলে নিজের কাজ করে গেছে। কোন পাপ করেনি। তোমার সঙ্গে যে লোকটা ছিল সে কোন দিন তপস্যায় মন বসায় নি। তোমাকে উপকার করার জন্য সে শুধু পশুপাখিদের মারধোর করেছে। ধোপার সঙ্গে ঝগড়া করেছে।" দেবদূত বললেন।

নির্বাচন

এক দেশের এক রাজা প্রত্যেক বছর বুদ্ধির পরীক্ষা করতেন। বহু যুবককে আহ্বান জানাতেন। এক বছর গণপতি যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় দিল।

"হাত থেকেও নেই এমন লোককে কেউ দেখেছেন?" প্রধান মন্ত্রীর প্রশ্ন।

কথার জবাবে গণপতি বলল : এখানে আসার সময় একজন ভিক্ষুক বলেছিল, "বাবা, ধর্ম হবে।" লোকটার হাতে কলম ও কাগজ ছিল। রাস্তায় যে যাচ্ছে তাকেই প্রশ্ন করছিল ভিক্ষুকটা। আমি আমার সাধ্যমত তাকে সাহায্য করেছিলাম। সে তৎক্ষণাৎ কাগজে লিখল "দুই"। "কি লিখছ কাগজে?" আমি তাকে প্রশ্ন করে ছিলাম। "কিছু নয়, যাদের হাত থেকেও নেই তাদের হিসেব রাখছি। আপনি দ্বিতীয় জন। যাঁরা দানধর্ম করেন না তাঁরাই হাত থেকেও না থাকাদের দলে।"

"এমন লোক তো থাকতে পারে যাদের চোখ থেকেও নেই?" বললেন মন্ত্রী।

একথার জবাবে গণপতি বলল : নিশ্চয়। একটা বাড়িতে তালা লাগানো ছিল। কিন্তু বাড়ির ভেতর থেকে কিসের যেন শব্দ শোনা যাচ্ছিল। "কে আছে ভিতরে?" বলে চিৎকার করে উঠেছিলাম। কোন জবাব পেলাম না। আমি তৎক্ষণাৎ আশে-পাশের লোককে ডেকে জড় করেছিলাম। ওরা চোরকে ধরে ফেলল। চোর আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেছিল, "আপনার মত চোখ থেকেও নেই এমন লোক খুব কম আছে। আমি চালিয়ে যাচ্ছিলাম এত দিন। তালা লাগানো

নারায়ণ গোস্বামী

দেখেও যারা বাড়ির ভিতরের শব্দকে ধরতে পারে তারাই চোখ থেকেও অন্ধ।

"তাহলে জিভ থেকেও বোবা কাদের বলবে?" মন্ত্রী আবার প্রশ্ন করলেন।

এই প্রশ্নের জবাবে গণপতি বলল: আমি ধার করতে গেলে লোকটা বলেছিল, "যারা জিভ থেকেও বোবা তাদের সুদের হার মাসে টাকায় চার আনা, আর যারা তা নয় তাদের সুদ লাগবে না।" বলেছিল সে। "তার মানে কি?"

"ধার নিয়ে যারা দেয় না, বাজে কথা বলে তারাই বোবা। মিথ্যে কথা বলে যারা টাকা নেয় তারাও তাই।" ধনী বলল।

"যা না বলে চলে যায় আর না জানিয়ে আসে তা মৃত্যু ছাড়া আর কি হতে পারে?" মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন সবাইকে।

এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারল না। গণপতি এগিয়ে এসে বলল, "যৌবন না বলে চলে যায়। না জানিয়ে যে সৌভাগ্যলক্ষ্মী আসে তাকে উপেক্ষা করা উচিত নয় বলে দাদুর কাছে জেনেছি।"

"অনেকবার যারা মরে তারা কি থাকে?" মন্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

এই প্রশ্নের জবাবও গণপতি দিল: এই নগরে ঢুকে এক মেয়েছেলেকে বাড়ির বারান্দায় বসে কাঁদতে দেখে প্রশ্ন করেছিলাম, "মা, আপনি কাঁদছেন কেন?" আমার প্রশ্নের জবাবে সে বলল, "না কেঁদে আর কি করব বাবা, আমার স্বামী যে প্রত্যেক দিন মারা যায়। আমাকে সারা জীবন কাঁদতে হচ্ছে। আমার বীর পুত্র দুবছর আগে একবার মরেছিল। আমার কর্তা খুব কাপুরুষ দিনে দশবার মরে।" বলল সে।

গণপতিকে চাকরি দেওয়া যেতে পারে বলে প্রধান মন্ত্রী রাজাকে পরামর্শ দিলেন। গণপতি চাকরি পেল রাজার অধীনে।

জ্ঞানোদয়
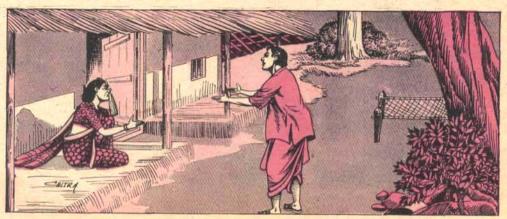
একজন জ্ঞানী পুরুষ লোককে ধরে ধরে জ্ঞানের কথা বলতেন। মানুষ যাতে সৎপথে চলে তার জন্য অনেক উপদেশ দিতেন ধর্ম কর্ম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি বিষয়ে। লোককে সৎপথে আনাকেই তিনি নিজের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি পারলেন না লোকের মনে সৎ চিন্তা ঢোকাতে। লোকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল। তা বুঝে জ্ঞানী পুরুষ অন্য গ্রামে চলে গেলেন।

সেই গ্রামের লোককেও উপদেশ দিতে লাগলেন। ঐ গ্রামের লোকও বিরক্ত হয়ে তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগল। শেষে জ্ঞানী ঠিক করলেন তপস্যা করবেন। এমন সময় এক চোর এসে বলল, "তোমার কাছে কি আছে দাও।"

"আমার কাছে কিছুই নেই। আমি সারা জীবন মানুষকে জ্ঞানী ও সৎ করে তোলার চেষ্টা করেছি। আমার কথা লোকে নিল না। আমার সারা জীবনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন আমি ঠিক করেছি এই বনে তপস্যা করব।"

তৎক্ষণাৎ জামা খুলে পিঠ দেখিয়ে সে বলল, "এই দেখ আমার পিঠ! দেখেছ কষাঘাত। যতবার ধরা পড়েছি পিঠ ফাটিয়ে দিয়েছে। তবু ছাড়িনি। যে কোন কাজ করতে যাও না কেন গালাগাল দেবার লোক থাকবেই।"

জ্ঞানীর জ্ঞানোদয় হল। তিনি ফিরে গেলেন লোককে বোঝাতে।

চোর-সাধু

প্রাচীনকালে রামনাথ সাহা নামে এক এক ব্যবসায়ী ছিল। লোকের সঙ্গে ব্যবহার ভাল করে এবং সততার সঙ্গে ব্যবসা করে লোকটা খুব নাম কিনল। ক্রমে তার ব্যবসার ক্ষেত্র শহরে ছড়িয়ে পড়ল। বহু ব্যবসায়ী তাকে ঈর্ষা করত।

একবার শহরের সমস্ত ব্যবসাদার বিভিন্ন জায়গা থেকে জিনিসপত্র কিনে গাড়ি বোঝাই করে শহরের দিকে রওনা হল।

অন্ধকার হয়ে গেল পথে। ওরা পথে পেল এক মন্দির। সেখানেই গাড়ি থামাল। রান্না করে খেল। তারপর ওরা সব রামনাথ সাহাকে বলল যে পাশের গ্রামে একটা মেলা দেখতে যাচ্ছে। তাদের জিনিস-পত্রের উপর যেন রামনাথ সাহা নজর রাখে। সেও তাদের প্রস্তাবে রাজী হল।

ওদের চলে যাওয়ার পর কয়েকজন লুণ্ঠন-কারী এসে রামনাথ সাহার চোখের সামনে ব্যবসায়ীদের জিনিসপত্রের বস্তা তুলে নিয়ে যেতে উদ্যত হল। রামনাথ বাধা দিতে গেলে ওরা তাকে মারধোর করে ফেলে রেখে সমস্ত জিনিস নিয়ে চলে গেল।

রামনাথ দুঃখে ভেঙ্গে পড়ল। তাকে মেরে লুণ্ঠনকারীরা অত জনের জিনিস নিয়ে গেছে বলেই যে দুঃখ পেয়েছে তা নয়; তার উপস্থিতিতে নিয়ে গেছে বলে তার দুঃখ হল। যা ঘটে গেছে তা তার সঙ্গী-দের জানানো উচিত ভেবে সেও ওরা যে দিকে গিয়েছিল সেদিকে হাঁটা দিল।

কিছুদূর যাওয়ার পর অনেকগুলো লোকের হৈ চৈ শুনতে পেল। কিছুটা এগিয়ে দেখতে পেল ওরা মারামারি

পঞ্চানন মিত্র

করছে। সে ঘটনাস্থলের আরও কাছে গিয়ে একটা গাছের উপর উঠে ওদের মারামারি দেখতে লাগল। ঐ লুণ্ঠনকারী-দের সঙ্গে অন্য একদল গুণ্ডাবাহিনীর মারামারি চলছে। অন্য পক্ষদের কথা শুনে রামনাথ বুঝল যে ওরাও চোর ডাকাত।

"এদের ধরে নিয়ে যেতে হবে আমাদের নেতার কাছে। এদের জানে মেরে ফেলা উচিত।" বলল নবাগত দলের একজন।

ঐ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এই দলের লোক বলল, "এই যে দাদারা, আমাদের আপনারা কোথায় নিয়ে যাবেন? মেরে ফেলবেন কেন? আমরা এসব জিনিস কোন জায়গা থেকে চুরি করে আনিনি। এসব আমাদের নিজেদের জিনিস। আমরা একজনকে অপদস্থ করার জন্য এসব কাণ্ড করেছি। শেষে যে আমরা এরকম একটা অবস্থায় পড়ব তা ভাবতে পারিনি। প্রয়োজন হলে আমরা এসব জিনিস দিয়ে দিচ্ছি।" বলে খোশামদ করতে লাগল সেই গুণ্ডার ছদ্মবেশধারী ব্যবসায়ীরা।

কিন্তু নবাগত গুণ্ডারা ওদের কথায় বিশ্বাস না করে বলল, "তোমরা যে চোর নও তার প্রমাণ কি? তোমাদের কথা যে মিথ্যা নয় তা কে প্রমাণ করবে? তোমাদের যা বলার নেতার কাছে বলবে।"

তখন ওরা নিজেদের ছদ্মবেশ খুলে গুণ্ডাদের সামনে দাঁড়িয়ে সকাতরভাবে

বলল, "আমাদের কি চোর-ডাকাতের মত লাগছে ?"

"তোমাদের চোর-ডাকাতের মতই লাগছে। পাকা চোরের মতই তোমাদের দেখাচ্ছে।" বলল ওরা।

ঠিক তখন গাছ থেকে নেমে চোর-ডাকাতদের সামনে দাঁড়িয়ে রামনাথ বলল, "এরা চোর-ডাকাত নয়। আমার সঙ্গে এরাও ব্যবসা বাণিজ্য করে। আমার উপর কোন কারণে এদের রাগ ছিল। তাই আমাকে বিপদে ফেলার তাল করেছে। এদের জিনিস পাহারা দেবার ভার আমার উপর দিয়েছিল। এরা আমার কাছে ক্ষতিপূরণ চাইত। এরা আমার ক্ষতি করতে চেয়েছিল কিন্তু তোমা-দের কোন ক্ষতি করেনি। তোমরা সমস্ত জিনিস নিয়ে যেতে পার কিন্তু এদের মারার ব্যবস্থা করো না। এদের ছেড়ে দাও।"

চোর-ডাকাতেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলল। রামনাথের কথা ওদের মনে ধরল। ওরা বলল রামনাথকে, "দেখুন, যে উদ্দেশ্যেই করুক, এরা যা করেছে তা চুরি ছাড়া অন্য কিছু নয়। অতএব, আমরা এদের কাছ থেকে এসব জিনিস নিয়ে আপনাকে দিয়ে দেব। আপনি ওগুলো নিয়ে নেবেন। যেহেতু এরা চোর আপনি সাধু। আপনি যোগ্য ব্যবসায়ী। এসব আপনি কিন্তু দেবেন না ওদের।"

যে কথা সেই কাজ। তারপর চোর-ডাকাতরা চলে গেল নিজেদের কাজে। রামনাথ যাদের জিনিস তাদের হাতে দিয়ে বলল, "তোমাদের চেয়ে ঐ চোরগুলো অনেক ভাল। তোমরা আসলে চোর, ব্যবসাদার নও। এই জন্যই তোমরা ব্যবসা করে নাম করতে পার না।"

ওরা রামনাথের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল। তার সামনে দাঁড়িয়ে কানমলা নাকমলা খেল। তারপর থেকে ওরা রামনাথের ভক্ত হয়ে উঠল।

মহাভারত

ভীষ্ম সেনাপতির পদে নিযুক্ত হলেন। দুর্যোধনকে তিনি বললেন, "কুমার কার্তিকেয়কে নমস্কার করে আমি সেনাপতিত্বের ভার নিলাম। দুশ্চিন্তা করোনা দুর্যোধন, ধর্মানুসারে যুদ্ধ করবো এবং তোমার সৈন্য রক্ষা করতে চেষ্টা করব।"

দুর্যোধন বললেন, "পিতামহ, গণনায় আপনি সুদক্ষ, উভয় পক্ষের রথী ও অতিরথ কে কে আছেন জানতে ইচ্ছা করি।"

ভীষ্ম বললেন, "তোমার ভ্রাতারা ও তুমি সকলেই শ্রেষ্ঠ রথী। ভোজ বংশীয় কৃতবর্মা, মদ্ররাজ শল্য যিনি নিজের ভাগিনেয়দের ছেড়ে তোমার দলে এসেছেন। সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা—এঁরা অতিরথ। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দুই রথীর সমান। কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, মাহিষ্মতীর রাজা নীল আর অবন্তি দেশের বিন্দ ও অনুবিন্দ, ত্রিগর্তদেশীয় সত্যরথ প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা, তোমার পুত্র লক্ষণ, দুঃশাসনের পুত্র কোশলরাজ বৃহদ্‌বল, তোমার মাতুল শকুনি, রাজা পৌরব, কর্ণপুত্র বৃষসেন, মধু বংশীয় জলসন্ধ, গান্ধারবাসী অচল ও বৃষক এঁরা সব রথী। কৃপাচার্য অতিরথ। দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা মহারথ। শুধু একটি মহাদোষের জন্য তাঁকে আমি রথী বা অতিরথ মনে করতে পারি না। কারণ তিনি নিজের জীবন অত্যন্ত ভালবাসেন। না হলে ইনি একজন অদ্বিতীয় বীর হতেন। দ্রোণাচার্য

করছেন। আমি দুর্যোধনের জন্যই সব সহ্য করেছি। আমার মতে আপনিই অর্ধরথ। লোকে বলে আপনি মিথ্যা বলেন না! আপনার ইচ্ছামত রথী আর অতিরথ বলে যোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি করেছেন। আপনার মৃত্যুর পর বিপক্ষের সকল মহা-রথের সাথে যুদ্ধ করব তার আগে নয়।"

তখন ভীষ্ম বললেন, "সূতপুত্র যুদ্ধের দেরী নেই। এ সময়ে আমাদের মধ্যে ভেদ থাকা উচিত নয়। তাই তুমি জীবিত থাকবে। স্বয়ং জামদগ্ন্য পরশুরাম আমাকে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত করতে পারেন নি। আর তুমি কি করতে পারবে?"
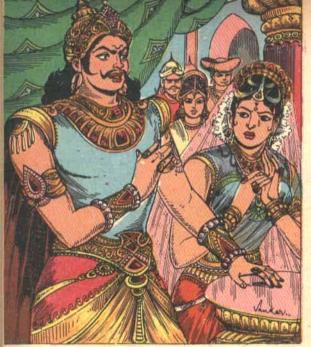
একজন শ্রেষ্ঠ অতিরথ। তিনি দেব গন্ধর্ব মনুষ্য সকলকেই বিনষ্ট করতে পারেন। কিন্তু স্নেহবশে অর্জুনকে বধ করতে পারবেন না। বাহ্লীক অতিরথ। তোমার সেনাপতি সত্যবান, মহাবল মায়াবী রাক্ষস অলম্বুষ, প্রাগ জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত এঁরা হলেন মহারথ। তোমার প্রিয় সখা ও মন্ত্রণাদাতা নীচ প্রকৃতি অহঙ্কারী কর্ণ অতিরথ নয়, পূর্ণরথীও নয়। এ পরনিন্দা করে। এর কবচকুণ্ডল নেই। পরশুরামের শাপে এর শক্তিও অনেক নষ্ট হয়েছে। আমার মতে কর্ণ অর্ধরথ, অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করলে জীবিত ফিরে আসবে না।"

কর্ণ ক্রোধে রক্তচক্ষু করে বললেন, আপনি বিনা দোষে আমাকে এভাবে পীড়ন

দুর্যোধন বললেন, "পিতামহ, কিসে মঙ্গল হবে তাই ভাবুন। দুজনকেই মহৎ কাজ করতে হবে। বলুন পাণ্ডব পক্ষের রথী, মহারথ ও অতিরথ কে কে আছেন।"

ভীষ্ম বললেন, "যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব ওরা সকলেই রথী। ভীম একাই আটজন রথীর সমান। স্বয়ং নারায়ণ যাঁর সহায় সেই অর্জুনের সমান বীর ও রথী উভয় সৈন্যের মধ্যে কেউ নেই। একমাত্র আমি আর দ্রোণাচার্য তাঁর সাথে যুদ্ধ করতে পারি। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সকলেই মহারথ। বিরাট পুত্র উত্তর, উত্তমৌজা, যুধামন্যু এবং দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী এঁরা শ্রেষ্ঠ রথী। অভিমন্যু, সাত্যকি ও দ্রোণ-

শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন এরা হলেন অতিরথ। বৃদ্ধ হলেও দ্রুপদ ও বিরাটকে আমি মহারথ বলেই মনে করি। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা এখনও বালক সেকারণে সে অর্ধরথ। শিশুপালপুত্র ধৃষ্টকেতু, জয়ন্ত, আমিতৌজা, সত্যজিৎ, অজ ভোজ ও রোচমান এঁরা মহারথ। কেকয় দেশীয় পঞ্চভ্রাতা, কাশীরাজ কুমার, নীল, সূর্যদত্ত, শঙ্খ, মদিরাশ্ব, ব্যাঘ্রসেন, চন্দ্রদত্ত, সেনাবিন্দু, ক্রোধহন্তা, কাশ্য এঁরা হলেন সকলেই রথী। দ্রুপদ-পুত্র সত্যজিৎ শ্রেণিমান ও বসুদান রাজা, কুন্তিভোজ দেশীয় পাণ্ডব মাতুল পুরুজিৎ এবং ভীম হিড়িম্বার পুত্র মায়াবী ঘটোৎকচ এঁরা যকলেই অতিরথ।" ভীষ্ম আরও বললেন, "আমি তোমার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করব। কিন্তু শিখণ্ডী শরক্ষেপে উদ্যত হলেও তাকে বধ করব না। কারণ সে পূর্বে স্ত্রী ছিল। পরে পুরুষ হয়েছে। আর পাণ্ডবগণকেও আমি বধ করব না।"

এরপর দুর্যোধন জিজ্ঞেস করলে, "পিতামহ, পূর্বে আপনি বলেছিলেন যে পাঞ্চাল ও সোমকদের বধ করবেন, তবে শিখণ্ডীকে ছেড়ে দেবেন কেন?"

ভীষ্ম উত্তর করলেন, কেন তাকে বধ করব না তার ইতিহাস বলছি শোন:— আমার ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর তাঁর কণিষ্ঠ বিচিত্রবীর্যকে আমি রাজার আসনে অভিষিক্ত করলাম। তাঁর বিবাহের জন্য কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ম্বর সভা থেকে নিজ বলে হরণ করেছিলাম। বিবাহের সময় বড় কন্যা অম্বা লজ্জিতভাবে জানালেন যে তাঁর পিতার অজ্ঞাতে তিনি শাল্বরাজ পরস্পরকে বরণ করেছেন। তখন আমি কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও একজন ধাত্রীর সঙ্গে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দিলাম অম্বাকে। তাঁর দুই বোন অম্বিকা ও অম্বালিকার সাথে বিচিত্রবীর্যের বিয়ে দিলাম। অম্বাকে দেখে শাল্ব বললেন, "আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে বরণ করতে পারি না। কারণ তুমি অন্যপূর্বা। ভীষ্ম তোমাকে হরণ করেছেন। তাঁর স্পর্শে তুমি আনন্দ পেয়েছ। কাজেই

তখন তপস্বীরা বললেন, "তুমি তোমার পিতার কাছে ফিরে যাও।" কিন্তু অম্বা রাজী হলেন না। হোত্রবাহন উপস্থিত হলেন। সব শুনে তিনি অম্বাকে বললেন, "আমার কাছেই তুমি থাক। তোমার অনুরোধে জামদগ্ন্য পরশুরাম ভীষ্মকে বধ করবেন। তিনি আমার বন্ধু। পরশুরামের প্রিয় অনুচর সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত হল। সব কথা শুনে তিনি বললেন, কি ভাবে তুমি এর প্রতিশোধ নিতে চাও? তুমি যদি ইচ্ছে কর পরশুরামের আদেশে শাল্বরাজ তোমাকে বিবাহ করবেন। আর যদি ভীষ্মকে নির্জিত দেখতে চাও তবে পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করবেন।"

অম্বা বললেন, "ভগবান, শাল্বের প্রতি ভালবাসা না জেনেই ভীষ্ম হরণ করেছিলেন। কাজেই ধর্ম সঙ্গত বিধান দিন।"

অকৃতব্রণ বললেন, "ভীষ্ম যদি তোমাকে হস্তিনাপুরে না নিয়ে যেতেন তাহলে শাল্ব তোমাকে স্ত্রীরূপে বরণ করতেন। এ কারনে ভীষ্মেরই শাস্তি প্রাপ্য।"

পরদিন অগ্নির সমান তেজস্বী পরশুরাম শিষ্যদের নিয়ে আশ্রমে এলেন। রূপবতী সুকুমারী অম্বার সব কথা শুনে তাঁর দয়া হল। বললেন, "ভাবিনি, ভীষ্মকে খবর পাঠাব। আমার কথা তিনি রাখবেন। যদি না রাখেন তবে তাঁর অমাত্যগণ সহ তাঁকে

তাঁর কাছেই তুমি যাও। অম্বা অনেক অনুরোধ করা সত্ত্বেও শাল্ব তাঁকে গ্রহণ করলেন না। অম্বা সেখান থেকে চলে এলেন এবং এই বলে রোদন করতে লাগলেন যে ভীষ্মকে ধিক, আমার মূর্খ পিতাকে ধিক। যিনি পণ্যস্ত্রীর মত আমাকে বীর্যশুল্কে দান করতে চেয়েছিলেন। ধিক শাল্বরাজকে, ধিক বিধাতাকেও। আমার এ অবস্থার জন্য ভীষ্মই একমাত্র দায়ী। তাঁর উপর আমি প্রতিশোধ নেব। অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেখানে তপস্বীদের নিজের কাহিনী জানিয়ে বললেন, আমি এখানে তপস্যা করতে ইচ্ছা করি।"

যুদ্ধে বিনষ্ট করব। তা যদি না চাও তবে শাল্বকেই আমি আদেশ করব।"

অম্বা বললেন, ভৃগুনন্দন শাল্বের প্রতি আমার ভালবাসা জেনেই ভীষ্ম আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু শাল্ব আমার চরিত্রের আশঙ্কায় গ্রহণ করেন নি। মনে হয় ভীষ্মই দায়ী। তাঁকে বধ করুন।"

পরশুরাম রাজী হলেন। তারপর অম্বাও ঋষিগণের সাথে কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরে এলেন।

ভীষ্ম বলতে লাগলেন, "তৃতীয় দিনে পরশুরাম দূত পাঠিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত-গণের সাথে তাঁর কাছে গেলাম আর একটি ধেনু উপহার দিলাম। তিনি আমার পূজা গ্রহণ করলেন। বললেন ভীষ্ম, তুমি অম্বাকে তাঁর অনিচ্ছায় নিয়ে এসে আবার তাকে ত্যাগ করলে কেন? তোমার স্পর্শের জন্যই শাল্ব তাঁকে গ্রহণ করেন নি। তাই আমার তুমি আদেশ অম্বাকে গ্রহণ কর।"

আমি তখন পরশুরামকে বললাম, "ভগবান আমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের সাথে এঁর বিয়ে দিতে পারছি না, কারণ ইনি পূর্বেই শাল্বের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। এজন্য আমি তাঁকে আবার শাল্বের কাছেই পাঠিয়েছিলাম। ভৃগুনন্দন আপনি ছেলে-বেলায় আমাকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছিলেন।

আমি আপনার শিষ্য। কেন আমার সাথে যুদ্ধ করতে চাইছেন?"

পরশুরাম রেগে গিয়ে বললেন, "তুমি আমাকে সম্মান দিচ্ছ অথচ আমার প্রিয়কাজ করতে চাইছ না। তুমিই এঁকে গ্রহণ করে বংশ রক্ষা কর।"

কিন্তু তাঁর আদেশ পালনে সম্মত নই দেখে তিনি বললেন, "আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে এস। আমার বাণে তুমি নিহত হবে। কঙ্ক ও কাক আহার করবে। মাতা জাহ্নবী তা দেখবেন।"

এরপর কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সাথে আমার ভীষণ যুদ্ধ হল। দেবতা ও ঋষিরা সে যুদ্ধ দেখতে এলেন। আমার মাতা
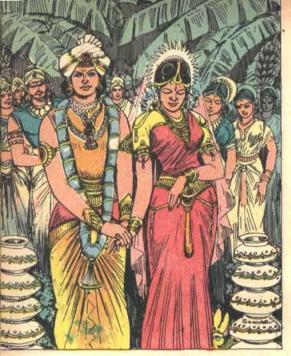
গঙ্গা মূর্তিমতী হয়ে আমাকে ও পরশুরামকে নিরস্ত করতে এলেন। কিন্তু তাও ব্যর্থ হল। আমি পরশুরামকে বললাম, "ভগবান, আপনি ভূমিতে আর আমি রথে চড়ে যুদ্ধ করতে চাইনা। আপনি কবচ ধারণ করে রথে চড়ে যুদ্ধ করুন।"

পরশুরাম হেসে বললেন, ভূমিই আমার রথ, বেদসকল আমার বাহন, বায়ু আমার সারথি, বেদমাতারা আমার কবচ। এই বলে তিনি বাণ ছুঁড়তে লাগলেন।"

আমি দেখলাম নগরের ন্যায় বিরাট দিব্যাশ্বযুক্ত নানা বর্ণের রথে আরোহণ করে আছেন। তাঁর সাথে চন্দ্রসূর্য চিহ্নিত কবচ। আর অকৃতব্রণ তাঁর সারথি।

অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর সাথে আমার যুদ্ধ হল। তিনি আমার সারথিকে বধ করলেন। আমাকেও শরাঘাতে মাটিতে ফেলে দিলেন। তখন আমি দেখতে পেলাম সূর্য ও অগ্নির মত তেজস্বী আটজন ব্রাহ্মণ আমাকে বেষ্টন করে আছেন। আমার মাতা গঙ্গা রথে রয়েছেন। আমি তাঁর পায়ে ধরে এবং পিতৃগণকে নমস্কার করে আমার রথে উঠলাম। গঙ্গাদেবী অদৃশ্য হলেন। আমি হৃদয়বিদারক বাণ নিক্ষেপ করলাম, তাতে পরশুরাম মূর্ছিত হয়ে জানুতে ভর দিয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সুস্থ হলেন এবং আমাকে মারার জন্য তাঁর চতুর্হস্ত ধনুতে শরযোজন করলেন। কিন্তু মহর্ষিগণ বারণ করলেন।

রাতে আমি স্বপ্ন দেখলাম সেই আগের আটজন ব্রাহ্মণ আমাকে বলছেন, গঙ্গানন্দন, পরশুরাম তোমাকে হারাতে পারবেন না। তুমিই জয়লাভ করবে। তুমি প্রস্বাপন অস্ত্র প্রয়োগ কর। তাতে তিনি নিহত হবেন না। তবে নিদ্রার আবেশে থেকে পরাজয় স্বীকার করবেন।

পরদিন কিছু সময় প্রচণ্ড যুদ্ধের পর প্রস্বাপন অস্ত্র নিক্ষেপের আয়েজন করলাম। কিন্তু নারদ বারণ করলেন। বললেন, "দেবগণ বারণ করছেন। পরশুরাম তপস্বী ব্রাহ্মণ এবং তোমার গুরু।"

ঠিক এই সময়ে পরশুরামের পিতৃগণ আবির্ভূত হলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, "বৎস, ভীষ্মের সাথে আর যুদ্ধ করোনা। এঁকে তুমি জয় করতে পারবে না।"

তারপর নারদ ও অন্যান্য মুনিগণ এবং আমার মাতা ভাগীরথী যুদ্ধক্ষেত্রে এলেন। তাঁরা সকলে আমাকে নিরস্ত হতে বললেন। তোমরা পরস্পরের অবধ্য।

পূর্বের আটজন ব্রাহ্মণ আবার আবির্ভূত হয়ে আমাকে বললেন, "মহাবাহু, তুমি তোমার গুরুর কাছে যাও। জগতের মঙ্গল কর।" আমি পরশুরামকে প্রণাম করলাম। তিনি সস্নেহে বললেন, "ভীষ্ম, তোমার সমান ক্ষত্রিয় বীর এ পৃথিবীতে নেই। আমি তুষ্ট হয়েছি, এবার যাও। তিনি অম্বাকে বললেন, ভাবিনি, আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করেও ভীষ্মকে জয় করতে পারিনি। তুমিই তাঁর শরণ নাও।"

অম্বা বললেন, "ভগবান আপনি যথা-সাধ্য করেছেন। অস্ত্র দ্বারা ভীষ্মকে জয় করা যাবে না। আমিই তাঁকে যুদ্ধে নিপাতিত করব।"

পরশুরাম চলে গেলেন মহেন্দ্র পর্বতে। অম্বা যমুনাতীরের আশ্রমে কঠোর তপস্যায় বসলেন। মহাদেব অম্বাকে বর দিতে এলেন। অম্বা বললেন, "আমি যেন ভীষ্মকে বধ করতে পারি।"

মহাদেব বললেন, "তুমি অন্য দেহে পুরুষত্ব লাভ করে ভীষ্মকে বধ করবে। বর্তমান দেহের সমস্ত ঘটনাই তোমার মনে থাকবে।" তুমি দ্রুপদের কন্যারূপে জন্ম নেবে এবং কিছুদিন পরে পুরুষ হবে।

যথাসময়ে দ্রুপদ মহিষী একটি পরমা সুন্দরী কন্যার জন্ম দিলেন। কিন্তু তিনি প্রচার করলেন যে তাঁর পুত্র হয়েছে। তাঁরা তাকে ছেলের মতই পালন করতে লাগলেন। নাম রাখলেন শিখণ্ডী। কিছু কাল পরে শিখণ্ডী গৃহত্যাগ করে গভীর বনে এলেন। সেখানে স্থূণাকর্ণ নামে যক্ষের প্রাসাদ ছিল। শিখণ্ডিণী তাতে প্রবেশ করলেন, আর বহুকাল অনাহারে থেকে দেহ

শীর্ণ করলেন। তারপর যক্ষ দয়ালু হয়ে বললেন, "তোমার ইচ্ছে আমি পূর্ণ করব।" শিখণ্ডিণী তাঁর সব ঘটনা জানিয়ে বললেন, "যক্ষ, আমাকে পুরুষ করে দিন।"

যক্ষ বললেন, "রাজকন্যা, আমার পুরুষত্ব কিছুকালের জন্য তোমাকে দেব। এতে তুমি তোমার পিতার রাজ্য ও বন্ধুগণকে রক্ষা করতে পারবে। পরে এসে আবার তুমি আমার পুরুষত্ব ফিরিয়ে দিও। শিখণ্ডিণী তাতে সম্মত হয়ে লিঙ্গ বিনিময় করলেন।

কিছুদিন পরে কুবের স্থূণাকর্ণের প্রাসাদে এলেন। তাঁর আদেশে অনুচররা স্থূণা-কর্ণকে নিয়ে এল। কুবের রেগে গিয়ে অভিশাপ দিলেন, "তুমি যক্ষগণের অপমান করেছ, কাজেই স্ত্রী হয়েই থাক। আর দ্রুপদকন্যা পুরুষ হয়েই থাক।"

পূর্বের প্রতিজ্ঞা অনুসারে শিখণ্ডী স্থূণা-কর্ণের কাছে ফিরে এল। স্থূণাকর্ণ বললেন, "আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। তারপর কুবেরের অভিশাপের কথা জানিয়ে বললেন, দৈবের ওপর আমাদের কোন হাত নেই। অতএব রাজপুত্র, তুমি ইচ্ছেমত চলাফেরা কর।"

শিখণ্ডী ফিরে এল রাজপ্রাসাদে। দ্রুপদ তাঁকে অস্ত্রশিক্ষার জন্য দ্রোণাচার্যের কাছে পাঠালেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের সাথে শিখণ্ডীও চতুষ্পাদ ধনুর্বেদ শিক্ষা করলেন।

সমস্ত ঘটনা শেষ করে ভীষ্ম বললেন, "দুর্যোধন, জড়, অন্ধ ও বধির সাজিয়ে গুপ্তচর পাঠাতাম দ্রুপদের কাছে। তারাই আমাকে এসব ঘটনা জানিয়েছিল। পূর্বে স্ত্রী ও পরে পুরুষত্ব লাভ করে শিখণ্ডী রথিশ্রেষ্ঠ হয়েছে। কাশীরাজের বড় কন্যা অম্বাই হল এই শিখণ্ডী। আমার এই প্রতিজ্ঞা সকলেই জানে যে, স্ত্রীলোককে, স্ত্রী থেকে পুরুষ হয়েছে এমন লোককে, স্ত্রী নামধারী ও স্ত্রীরূপধারী কোন পুরুষকে আমি শরাঘাত করি না।

মিত্র-ভেদ

দক্ষিণ ভারতের মহিলারূপ্য নগরে রাজা অমরশক্তি শাসন করতেন। তিনি ছিলেন বলবান, দয়াবান, বুদ্ধিমান এবং ললিতকলায় দক্ষ ও রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। সেই রাজার বসুশক্তি, উগ্রশক্তি ও অনেক-শক্তি নামে তিনটি ছেলে ছিল। তিন ছেলেরই লেখাপড়ায় মন বসত না। এই কারণে রাজা খুব মনমরা ছিলেন। মনে মনে একটা গভীর দুঃখ পোষণ করতেন।

একদিন মন্ত্রীদের ডেকে বললেন, "তোমরা জান যে আমার তিন পুত্র কেমন মূর্খ হয়েছে। জ্ঞানবুদ্ধিহীন পুত্র মাত্রেই দুধহীন গরুর সমান। যে গরু দুধ দেয় না তাকে গোয়ালে রাখি না, এই ধরণের মূর্খ পুত্রও আমি চাই না। এই ছেলেদের বাপ হওয়ার চেয়ে আমার সাধু হয়ে থাকা অনেক ভাল ছিল। এখন তোমরা ভেবে চিন্তে দেখ, এমন কোন পথ আছে কিনা যাতে এদের শিক্ষিত করে রাজনীতিতে বিজ্ঞ করে তোলা যায়।"

একজন মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এই নগরেই বিষ্ণুশর্মা নামে একজন গুরু আছেন। তিনি সমস্ত বিদ্যায় নিপুণ ও সিদ্ধ। তিনি খুব সরলভাবে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়ে থাকেন। মহারাজ, আপনি যদি আপনার পুত্রদের তাঁর হাতে সঁপে দেন তাহলে আপনার পুত্ররা অবশ্যই অতি অল্পকালের মধ্যে রাজনীতি ও জাগতিক সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানী হয়ে উঠবে।"

রাজা তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুশর্মাকে ডেকে পাঠালেন! তাঁকে বললেন, যে তিনি যদি তাঁর পুত্রদের জ্ঞানী করে তুলতে পারেন

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

তাহলে তাঁকে একশোটা গ্রাম পুরস্কার দেবেন।

একথা শুনে বিষ্ণুশর্মা বললেন, "মহারাজ, আমি বিদ্যা বিক্রি করি না। আমার আশী বছর বয়স হল এখন অত গ্রাম নিয়ে কি করব? যে চায় তাকে বিদ্যা দান করা আমার কর্তব্য বলে মনে করি। ছমাসের মধ্যে আমি আপনার ছেলেদের রাজনীতি ও জগতের অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞানী করে তুলব।"

বিষ্ণুশর্মার কথা শুনে রাজা খুব প্রসন্ন হলেন। তিনি তাঁর পুত্রদের বিষ্ণুশর্মার হাতে সঁপে দিলেন। বিষ্ণুশর্মা তাদের পঞ্চতন্ত্রকে পাঁচ ভাগে পড়ালেন। মিত্র-ভেদ, মিত্রসম্প্রাপ্তি, কাকোলুকীয়, লব্ধ প্রণাশ ও অপরীক্ষিত কারক প্রভৃতি। এই পঞ্চতন্ত্র পড়ে রাজকুমারগণ পাঁচমাসে রাজনীতি ও জগত সংসারের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানবান হয়ে উঠলেন।

দক্ষিণ দেশে মহিলারূপ্য নামে এক নগরে বর্ধমান নামে এক ধনী ব্যবসায়ী ছিল। লোকটা খুব ধনী, নীতিবান ও দানশীল ছিল। সে খুব সহজেই অর্থ উপার্জন করে প্রয়োজন মত খরচ করত। তার মত ছিল প্রচুর অর্থ উপার্জন কর ও হিসেব করে খরচ কর।

একদিন বর্ধমান গরুর গাড়িতে দামী জিনিস চাপিয়ে যমুনার তীরে অবস্থিত মথুরা নগরে গেল। একটা গাড়িতে নন্দীক ও সঞ্জীবক নামে দুটো বলদ যোথা ছিল।

কিছুদিন পরে ব্যবসায়ী দল যমুনা নদীর তীরের এক বনে এল। ঐ বনে অনেক রকমের গাছ ছিল। আর ছিল নানা ধরণের বুনো জানোয়ার। সেখানে কাদায় পা হড়কে সঞ্জীবক বলদের পা ভাঙ্গল।

বর্ধমানের খুব দুঃখ হল। পাঁচ দিন ধরে সেখানেই বসে থাকতে হল। সঞ্জীবকের ভাঙ্গা প্যা সারানোর চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুতেই আর সারল না। বর্ধমানের মথুরা নগরে যাওয়ার তাড়া ছিল। ব্যবসার কাজে তো না গেলেই নয়। তখন সে ঐ

বলদকে দেখাশোনার জন্য গরুর গাড়ির চালক ও তার এক চাকরকে রেখে গেল। খরচ পত্তরের যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার জন্য অর্থও দিয়ে গেল তাদের হাতে। যাওয়ার সময় সে বলে গেল, "তোমরা এই বলদের পা যাতে ঠিক হয়ে যায় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে আর যদি কোন ক্রমেই না সারে, যদি বলদটা মারা যায় তখন তার দাহ কাজ ভাল ভাবে করে ফিরবে আমার কাছে।"

এই সব কথা বলে বর্ধমান তার অন্য গরুর গাড়ি ও জিনিসপত্র নিয়ে মথুরা চলে গেল। তার চলে যাওয়ার পর ঐ বনে থাকতে ভয় পেল গাড়োয়ান আর বর্ধমানের চাকর। বলদটাকে ওখানেই ছেড়ে সোজা মালিকের কাছে গিয়ে জানাল যে বলদ মরে গেছে ও দহন ইত্যাদি কাজ সেরে চলে এসেছে।

ওদিকে বলদ সেরে উঠল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে ঐ বলদ যমুনার তীরে পৌঁছাল। কচি কচি ঘাস খেয়ে আর যমুনার স্বচ্ছ জল পান করে বলদটি অল্প দিনের মধ্যেই আগের মত তাজা হয়ে উঠল। সে যেন শিবের নন্দী। একটি যোগ্য বাহন। গায়ে গতরে বেড়ে উঠে সে মনের আনন্দে চারদিকে চরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

ঐ বনেই একটা সিংহ থাকত। সে শেয়াল ও অন্য জন্তুজানোয়ারদের সঙ্গে দল পাকিয়ে ঘুরে বেড়াত। একদিন সিংহ যমুনা নদীতে জল পান করতে গিয়ে সঞ্জীবকের রম্ভা ডাক শুনে সে খুব ভয় পেল। এরকম বিচিত্র ধ্বনি কে করছে তা সে বুঝতে পারল না। এ নিয়ে কাউকে কোন প্রশ্ন না করে জল পান না করে সোজা নিজের আস্তানায় ফিরে এল। অন্যান্য জানোয়ার তাকে সব সময় সসম্মানে ঘিরে থাকে। সিংহ তো জন্ম থেকেই রাজা। মানুষের মত তাকে তো আর জ্ঞান বুদ্ধি অর্জন করার পর পোশাক ধারণ করে সিংহাসনে বসতে হয় না। তার সিংহাসন একটা আছেই পশুর রাজ্যে।

• সিংহের আশেপাশে করটক ও দমনক নামে দুটো শেয়াল থাকত। এই দুটো শেয়ালের বাবা-মা সিংহের অধীনে একটা পদ নিয়ে থাকত। কিন্তু এদের ভাগ্যে কোন পদ জোটেনি। দমনক লক্ষ্য করল সিংহ নদীতে জল পান না করে ফিরে গেল। সে নিজের ভাই করটককে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলল, "ভাই, তুমি লক্ষ্য করেছ আমাদের রাজা পিঙ্গলক জল না খেয়ে ফিরে গেছে? ওর মুখটা কেমন ঝুলে গেছে দেখ।"

একথায় করটক বলল, "ভাই, রাজা-রাজড়াদের ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামানো উচিত নয়। এই ধরণের চঞ্চলমতি বানরের মত কাজ করলে তোমাকে আর বেশিদিন বাঁচতে হবে না। কিলক টানতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বে।"

"কি বলছ? কার কথা বলছ? খুলে বল।" দমনক বলল।

করটক চঞ্চল প্রকৃতির এক বানরের কাহিনী শোনাল: এক শহরে এক ব্যবসায়ী একটা মন্দির গড়াচ্ছিল। প্রত্যেকদিন দুপুরে কারিগররা খেতে বাড়ি যেত। ওরা বিরাট বিরাট কাঠ করাত দিয়ে কাটত। একদিন অনেকগুলো বানর ওখানে এল। কাঠুরেরা একটা কাঠ অনেকখানি করাত দিয়ে কেটে, যতটা কাটল সেখানে একটা কিলক ঢুকিয়ে খেতে চলে গেল। তখন তাদের মধ্যে একটা চঞ্চল বানর ভাবল, অযথা এই কিলকটা এখানে থাকবে কেন? তারপর সে দুহাতে টেনে ঐ কিলকটাকে তুলে দিল। কিলকটিকে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বানরটি ঐ চেরা কাঠের ফাঁকে আটকে তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

কাহিনীটি শেষ করে করটক বলল, "তাই বলছি, ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ো না। শেষে না খেতে পেয়ে মারা পড়ব।"

(আরও আছে)

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ঘড়ি

আমেরিকার নিউজের্সীতে জের্সী নামে এক নগর আছে। এই নগরে 'কল্গেট-পামালীভ-পীঠ' ফ্যাক্টরীর গায়ে এই ঘড়ি লাগানো আছে। এই ঘড়ির মুখ ৫০ ফুট চওড়া। চিত্রে অঙ্কিত মানুষটিকে '৫ মিনিট' বোঝানোর চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। লোকটির উচ্চতা ৭ ফুট। মিনিটের কাঁটা দিনে কম করে ৬ ফার্লাঙ্গ দূরত্ব অতিক্রম করে। এই ঘড়ির মুখে ৩৪৫টি বাল্ব জ্বালানো হয়।
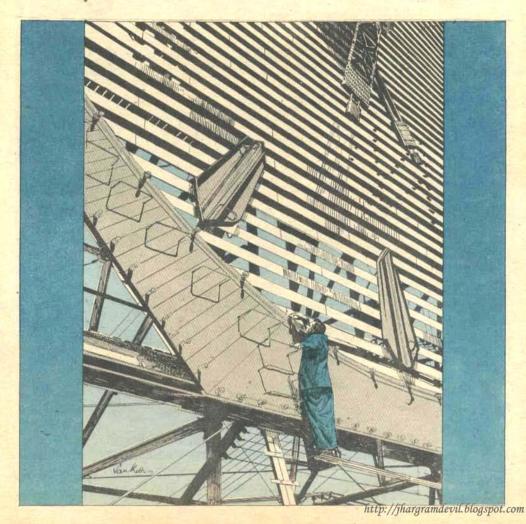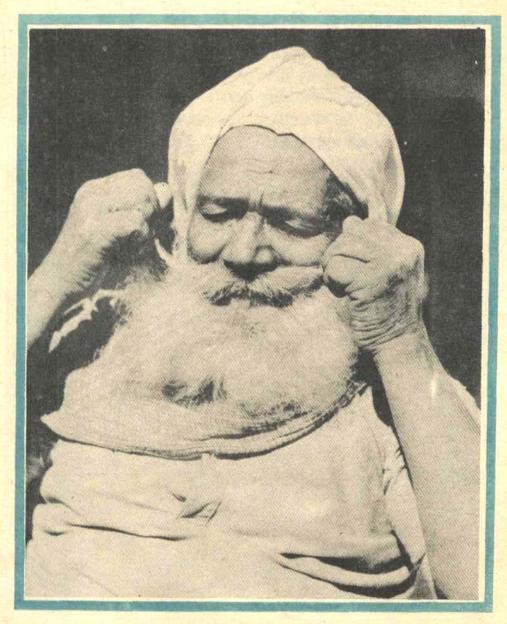
ফটো : সুভাস ভর্মা

পুরস্কৃত
নাম

পক্ক সৌন্দর্য

পুরস্কার পেলেন
রীণা ভট্টাচার্য

ফটো : আর. পি. রাম
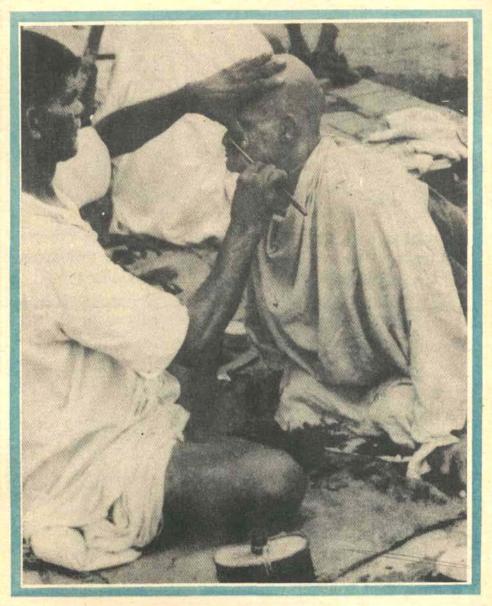
৩১১, বাসুদেবপুর রোড,
শ্যামনগর, ২৪-পরগণা

রিক্ত ঔদার্য

পুরস্কৃত
নাম

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা :: পুরস্কার ২০ টাকা

★

* ফটো-নামকরণ ২০শে সেপ্টেম্বর '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
* ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো নভেম্বর '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
সাদা নৌকা

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
পাল তোলা নৌকা

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road, Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

চাঁদমামার গ্রাহকদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

আপনি যদি নিজের ঠিকানা বদলাতে চান তাহলে পাঁচ তারিখের মধ্যে গ্রাহক সংখ্যাসহ আপনার নতুন ঠিকানা আমাদের জানান। দেরি করলে পরের মাস থেকে নতুন ঠিকানায় 'চাঁদমামা' পাঠাব। আপনার সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

ডলটন্ এজেন্সীস

চাঁদমামা বিল্ডিংস

মাদ্রাজ-২৬

আপনাদের চাহিদাতেই
এর জনপ্রিয়তা দ্বিগুণ হয়ে উঠেছে
লিপটনের রুবি ডাস্ট
RUBY
DUST
প্রতি প্যাকেটে পাবেন
ঢের বেশি কাপ চা
তাই এর কদর
দিন দিন বেড়েই চলেছে
একমাত্র প্যাকেটের চা-ই থাকে তরতাজা, থাকে স্বাদগন্ধে ভরপুর
লিপটন
বললেই
ভালো চা
LIPTON
LRDC-9/73 BEN

Photo by: A. L. SYED

CHANDAMAMA (Bengali) SEPTEMBER 1973 Regd. No. M. 9100